অভিমানে

যে অনুভূতি কাছে টানে, যে অনুভূতি দূরে রাখে।

দীপান্বিতা কুণ্ডু

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Dipanwita Kundu 2026

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

BlueRoseONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

For permissions requests or inquiries regarding this publication, please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7825-887-9

Cover Design: Ajay Dhyani

First Edition: April 2026

সূচিপত্র

বিভা.. 1
রাহি... 108
সমাপ্তি...117
আদর... 129

বিভা

১

মা- বিভু, ও বিভু... বিভু !!

আবার কী হলো মা ? রান্নাঘর থেকে বলে উঠল বিভা।

বিভার মা অন্য ঘরে শুয়ে আছে - হ্যাঁরে, তোর রুটি করা হল?

বিভা বলল- না, হয়ে এসেছে। আমাকে ডাকছো কেন?

মা বলল- আমার পায়ে বড় বেদনা করছে।

আমি বাকি রুটি গুলো করে আসছি, ততক্ষণ তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো।

এই বলে বিভা আবার রান্নাঘরে ফিরে আসে, বাকি রুটি গুলো সেঁকে , একটা ছোট্ট বাটিতে তেল নিয়ে সেটিকে গরম তাওয়ার উপর বসিয়ে দেয়, কিছুক্ষণ পর তেলটি বেশ গরম হয়ে এলে বাটিটিকে সাঁড়াশি দিয়ে ধরে, তার মায়ের ঘরে নিয়ে আসে।

ঘরটা বেশি বড়ো না আবার খুব ছোটোও না। পূর্বদিকের দেওয়ালটায় বড়ো বড়ো দুটো জানালা, এখন দুটিই খোলা। উত্তর দিকের পশ্চিম কোনটা ঘেসে একটা আলমারি। তার পাশেই দেওয়াল আলমারি, সেখানে তিনটে তাক্। নীচের তাকে মাঝারি সাইজের ওষুধের বোতল, ট্যাবলেটের পাতা, কাগজ - ওষুধের প্রেসক্রিপশন হবে বোধ হয়, মাঝের তাকে আয়না, চিরুনি, পাউডার, মুখে মাথার ক্রিম, একটা বহুদিনের পুরোনো আলতার শিশি।

আর ছোটো খাটো ক্লিপ, গার্ডার- এইসব। উপরের তাকে মহাভারত, একটা লাল শালু দিয়ে মোড়া গীতা, পঞ্জিকা আর একটা লাল ছোট্ট পুটুলি (বেঁধে রাখা পুজোর শুকনো ফুল)। দক্ষিণ দিকে জানালার সাথে লাগোয়া একটা খাট, আর পশ্চিম দিকের কোণ ঘেসে দরজা।

খাটটাতে বিভার মা শুয়ে আছে। বয়স বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশের এধারে ওধারে হলেও দেখে মনে হবে পঞ্চাশের উপর। রুগ্ণ, হাত পা গুলি সরু সরু, গলার সামান্য নীচে দুটি হাড় যেন দুটি তলোয়ারের মতো বেরিয়ে আছে, গায়ের আসল

রঙ তেজী সূর্যটা খেয়ে নিয়েছে , গাল দুটো মাড়ির সঙ্গে একেবারে বসে গিয়েছে, বিভীষিকাময় গর্তে থাকা সাপের মতো চোখের মনিগুলির যেন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে , হলুদাভ আস্তরণ পড়েছে তাতে, মাথার সামনের দিকের অংশের চুলগুলি উঠে উঠে একেবারে টাক হয়ে গেছে, তাঁর সুমধুর কন্ঠস্বরও ক্যান্সারের বিষবাষ্পে বিষিয়ে গেছে। তাঁর শরীরে সধবা মহিলার কোনো চিহ্ন নেই। পাঁচ বছর আগে তাঁর স্বামী এক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, তারপর থেকেই তাঁর পঁচিশ বছরের একমাত্র মেয়ে, বিভাকে নিয়েই তাঁর সংসার। স্বামী সরকারি চাকরি করতেন, ফলে স্বামী মারা যাওয়ার পরও শিউলি দেবী পেনশন পান I তারপর দুবছর আগে বিভা হাইস্কুলের চাকরিটা পায়। তাদের দুজনের সংসারে সচ্ছলতা ফিরতে না ফিরতেই, বছর খানেকের মধ্যেই বিভার মায়ের লিভারের ক্যান্সারটা ধরা পড়ে। তখন ফোর স্টেজ চলছে। ডাক্তার জবাব দিয়ে দেয়।

তখন থেকে শিউলি দেবী বিছানা ধরেন। বিভা সকাল সাড়ে নটা নাগাদ স্কুলের জন্য বেরিয়ে পড়ে। বিকেল পাঁচটায় ঘর ঢোকে। ততক্ষণ একটি কাজের লোক ভাবনা, শিউলিদেবীকে দেখাশোনা করে। দুপুরের রান্নাবান্না ভাবনাই করে, রাতে খাবার বিভা বানায়। বিভা, মেয়েটি দেখতে শুনতে বেশ! গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো। চোখ দুটি বড়ো বড়ো, চোখের মনির রঙ কালো। দুটি ভ্রু-এর দুপ্রান্ত বেশ শৌখিন, ঠোঁট দুটি রক্তাভ লাল, দুটি ঠোঁটের উষ্ণতা সমান, ঠোঁট আর থুতনির মাঝামাঝি জায়গায়, ঈষৎ ডানদিক ঘেঁষে একটি তিল, চুল অল্প কোঁকড়ানো, বিনুনি অবস্থায় কোমরের থেকে এক আঙুল উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। অল্প দুর্বল হলেও, তার স্বাস্থ্য বেশ ভালোই, পরনে সুতির সালোয়ার কামিজ। শরীরের কোনো অংশেই শেকড়-বাকড়, কবজ-তাবিজের কোনো বালাই নেই।

-কই দেখি। মা, পা টা দেখি- এই বলে বিভা, শিউলিদেবীর পায়ে তেল দিতে শুরু করে।

শিউলি দেবী বললেন - উঃ, আজ সকাল থেকে পাটা বড় টন্ টন্ করছে।

বিভা বলল - ভাবনা বৌদিকে বলেছিলে পায়ে তেল দিয়ে দিতে?

শিউলি দেবী মুখ বেঁকিয়ে বললেন- না।

- কেন ? ওকে কী বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর জন্য মাস গেলে পাঁচ হাজার করে টাকা দিই?

- এই মরণকালে, অপরের সেবা নিয়ে আর পাপের ভাগী হতে চায় না।

বিভা বলল - শুধু পায়ে তেল দিয়ে দিলেই বুঝি সেবা নেওয়া হয়, আর খাওয়ানো, স্নান করানোতে সেবা নেওয়া হয় না?

তাছাড়া আমার কাছ থেকে সেবা নিলে তুমি কোন পুণ্যিটা লাভ করবে শুনি?

শিউলি দেবী বিরক্ত হয়ে বললেন - ওহ্ ! আর অত কথা বলতে পারছি না। হ্যাঁরে, বিভু, আজ কী বার রে?

- শনিবার, কেন?

শিউলি দেবী বললেন - কাল তো তাহলে তোর স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি, কাল রাতে তোর মামা আর মামী আসছে। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাংস কিনে নিয়ে আসিস।

বিভা বলল - সে না হয় আনা যাবে, কিন্তু তারা হঠাৎ করে কেন আসছে?

- ওমা ! তারা কী আমাকে দেখতে আসতে পারেনা ? তারা ছাড়া আমার আর আপনার কে আছে?

- তাই বল ! বেশ তো, তোমার ওই আপনার লোকেদের সাথে কাল তোমায় মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেব, আমিও রোজ রোজ তোমার এই রোগা পা টিপে দিতে পারব না।

- রাগ করলি নাকি রে? তা করগে যা, তারা অন্তত আমার সুখের কথাটা ভাবে। মরবার আগে আমার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা তো করে !

শিউলিদেবীর কথাটা শুনে বিভার হাত থেমে যায়, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার গোটা শরীরটা কান্নাবাষ্পে ভরে যায়। এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু সুরে সে বলল - তোমার কোন ইচ্ছেটা আমি পূরণ করিনি, মা ?

শিউলি দেবী বিভার হাতটা ধরে বললেন- একজন মায়ের, তার মেয়েকে নিয়ে সবচেয়ে বড়ো যে ইচ্ছেটা থাকতে পারে।

- বিয়ের কথা বলছো মা ! আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোমাকে কে দেখবে, মা?

- তোর জন্যই যে আমি প্রাণটা ছাড়তে পারছিনা। আমার আজকাল কিছু একটা হয়ে গেলে তুই কাকে অবলম্বন করে বাঁচবি বল দেখি?

- আজ-কাল কেন বলছো মা? এখনও অনেকদিন তোমাকে, আমায় মানুষ করতে হবে। আমায় রান্না শেখাবে না? তখন তো রান্না শেখানোর জন্য আমায় খুব জ্বালাতন করতে।

শিউলি দেবী হেসে বললেন- ওই দেখো, তুই কী এখনো সেই ছোট্টটি আছিস যে তোকে মানুষ করতে হবে ? পঁচিশ পেরিয়ে গেলি, আর কী শেখাবো তোকে আমি ?

আর রান্না! আমি তোকে এমন কারো হাতে তুলে দেবো না, যে তোকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে বলবে। আমি তোর সাথে এমন কারোর বিয়ে দেব যে তোকে রাজরানী করে রাখবে। সবই তো ঠিক আছে, শুধু একটা জিনিসই তোকে শেখাতে পারলাম না।

- কী, জিনিস?

- তোর বাবা, আমি কত করে চেষ্টা করে গেলাম, তবুও তোর মনের মধ্যে ভগবানের প্রতি এতটুকু বিশ্বাস জন্মালো না।

বিভা হেসে বলল- যার কোনো অস্তিত্বই নেই তাকে খামোকা বিশ্বাস করতে যাব কেন?

- জানিনা; তবে নিজের জন্য অনেক সময় কিছু বিষয়ে বিশ্বাস করতে হয়, তাতে নিজের মন ভালো থাকে, শরীরও ভালো থাকে।

- আমি তো ভালোই আছি, চিরকাল সত্যিটাকে মেনে এসেছি, আমার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই আর কোনো সংকট ও নেই।

- সংকট না থাকলে তুই কী নিজেকে এই সমাজের মানুষজনদের থেকে আলাদা করে গড়তে পারতি ?

সে জাগগে, আমি পারলাম না তো কী হয়েছে, তবে একদিন না একদিন কেউ তোর এই ভুল ভেঙে দেবে। সেদিন বুঝবি মা-বাবা ঠিকই বলত।

বিভা তার মরণাপন্ন মায়ের মুখের উপর কথা বলে আর তর্ক বাড়াতে চায়ল না।

প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘোরানোর জন্য সে বলল- ভাবনা বৌদিকে কাল বিছানার চাদর-টাদর গুলো একটু পাল্টে দিতে বলবে, আমি নতুন চাদর বের করে দিয়ে যাব। আর কালকে স্কুল থেকে ফেরার পথে একটু বাজার দিকে যাব, তুমি আবার বার বার ফোন করো না যেন !

শিউলি দেবী বললেন - সে তুই কাল যেখানে যাওয়ার আছে যাবি, কিন্তু পরশু তোকে ঘর থেকে বেরোতে দেব না।

বিভা তার মায়ের কাছ থেকে উঠে বলল - সে দেখা যাবে। এখন ওঠো তো, আমি তোমার খাবার আনছি, রাত নটা বাজতে গেল।

আবার খাওয়া ! খেতে আমার ভালো লাগেনা- শিউলি দেবী মুখ কাঁচু মাঁচু করে বললেন।

- তা ভালো লাগবে কেন? তোমার তো শুধু কথা বলতে ভালো লাগে ! একদম চুপ করে থাকো, আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি - এই বলে বিভা ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে যায় ।

২

সকাল নটা নাগাদ বিভা স্কুল যাবার জন্য তৈরি হয়ে যায়। সে দোতলার রুমে থাকে । তার মা তার পাশে অন্য একটা রুমে থাকে। রান্নাঘর, বাথরুম সবই দোতলায়। তার নীচের তলায় তার কাকু কাকীমা থাকে। রান্নাবান্না আলাদা হলেও কথাবার্তা যে একেবারেই নেই তা নয়।

ভাবনা এসে হাজির হয়, তাকে দেখে বিভা মৃদু হেসে বলল- আজ বড়ো সকাল সকালে যে ?

ভাবনা হাসতে হাসতে বলল - সকাল আর কুথায়? আমি তো নটাতেই আসি।

বিভা বলল - আচ্ছা !

যাকগে, ভালোই হয়েছে তোমার সাথে আমার দেখা হয়ে গেল, তোমাকে কিছু বলার ছিল।

ভাবনা বলল - হ , বল, কী বলবি?

- আজ মামা, মামীরা আসবে, তুমি বিছানার চাদরগুলো পাল্টে দিও, আমি নতুন চাদর বের করে বিছানার উপর রেখে দিয়েছি। আর মা কাল বলছিল, মায়ের পা ব্যথা করছে । স্নান করানোর আগে একটু পায়ে তেল দিয়ে দিও তো।

- সে তো আমি রোজই দিই। বাবা, কী বলব তোকে কালকে পা টিপিয়ে টিপিয়ে আমার তো হাতই বেদনা ধরিয়ে দিল গো ! পা টেপা বন্ধ করলেই আবার চেঁচাচ্ছে আমাকে ।

বিভা হেসে বলল- কী আর করবে বলো? রোগটা , শান্ত মানুষটাকে খিটখিটে বানিয়ে দিয়েছে। তুমি মায়ের কথা ধরোনা।

- সে কী আর আমি জানিনাই । বলি, ও বিভা, আজ তো ১ তারিখ হয়ে গেল।

বিভা চোখ বড় বড় করে বলল - তাই নাকি? তাই বলি, বৌদির তো আবার ১ তারিখ ছাড়া সকাল সকাল ঘুমই ভাঙে না।

ভাবনা, তার সেই রোগা রোগা, কালো মুখে সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল- তুই যে কি বলিস না লো !

- হাসিটা তুমি বরং বিকেলের জন্য তুলে রাখো । আমার এখনো টাকা তোলা হয়নি , বিকেলে তুলে নিয়ে আসব ।

ভাবনা তার শাড়ির আঁচলটা কোমরে গুঁজে বলল - আজ অন্যরকম কিছু রান্না করতে হবে নাকি গো বিভা রাণী?

বিভা বলল - না না, এমনি যেমন রান্না করো তেমনি করবে । মামা মামীরা সন্ধ্যেবেলায় আসবে । আর হ্যাঁ, তুমি শুধু একটু পায়েস করে রেখো । আমাদের কলি পায়েস খেতে খুব ভালোবাসে।

- তা যা বলেছিস। কাল দেখবি ঘর মাথায় করে রাখবেক । আমাকে আর কোনো কাজ করতেই দিবেক নাই।

কিছুক্ষণ পর বিভা স্কুলে যাবার বেরিয়ে পড়ে, ভাবনাও তার নিজের কাজে চলে যায় ।

সন্ধ্যেবেলায় ছটা নাগাদ বিভা বাড়ি ফিরে আসে । বাজার থেকে যা যা এনেছিল, সেগুলোই রান্নাঘরে রেখে দিয়ে তার মায়ের ঘরে যায়।

ভাবনা তখনও তার মায়ের ঘরে খাটের পাশে মেঝেতে বসেছিল , তার মায়ের সাথে গল্প করছিল । ভাবনার এত দেরি পর্যন্ত থেকে যাওয়ার কারণ বিভার কাছে অজানা ছিল না । তাই সে ঘরে ঢুকেই তার সাইড ব্যাগ থেকে কিছুটা টাকা বের করে তার মধ্যে থেকে পাঁচ হাজার টাকা গুণে ভাবনা কে দিয়ে বলল - এই নাও তোমার টাকাটা রাখো।

তারপর ভাবনা টাকাটা নিয়ে চলে যায় । বিভা বাইরের জামা কাপড় ছাড়তে তার রুমে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিঁড়ি দিয়ে একটা ছয় বছরের মোটা-সোটা মিষ্টি মেয়ে চিৎকার করতে করতে দৌড়াতে দৌড়াতে আসে । চিৎকার শুনে বিভা বাইরে বারিয়ে আসে।

বাচ্চা মেয়েটি এসেই বিভার কোমর জোড়িয়ে ধরে বলল - বিভাদিদি !

তার পেছনে পেছনে বিভার মামা আর মামী এসে হাজির হয়। তার মামা এমনিতে ভালোই কিন্তু অল্প ঝামেলাতেই মহাভারত বাধিয়ে দেয়। কিন্তু তার মামী শান্তশিষ্ট গোছের। সবসময় মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। আর তাদের ছয় বছরের মেয়ে কলি বড়োই দূরন্ত।

বিভা কলিকে তার কোলে তুলে নিয়ে বলল- কীরে কলি, এতদিন পর তোর বিভাদিদিকে মনে পড়ল?

কলি বলল- জানতো বিভা দিদি, আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে।

- তাই নাকি, তবে কিছুদিন তোকে আর ছাড়ছিনা।

কলি অমনি সাথে সাথে তার মাকে বলে উঠল- ওমা, তাহলে আমি এখন বিভাদিদির কাছে থাকব।

মামী বলল- ঘর ঢুকাতে না ঢুকাতে তোর শুরু হয়ে গেল? থাকবি, থাকবি নে, যতদিন ইচ্ছে থাকবি।

মামা বলল - নে বুড়ি, কলিকে নামিয়ে একটু জল নিয়ে আয় দেখি। বড় জল তেষ্টা পেয়েছে ।

বিভা বলল - হ্যাঁ, তোমরা মায়ের সাথে দেখা করে এসো আমি জল নিয়ে আসছি। চল কলি তুইও আমার সাথে চল।

মামা আর মামী তার মায়ের ঘরে চলে যায় এবং বিভা কলিকে নিয়ে রান্নাঘরে আসে, সেখানে বিভা ফ্রিজ থেকে একটা জলের বোতল বের করে আর আগে থেকে রাখা একটা চকলেট বের করে কলিকে দেয়। অমনি কলি, বিভার কোল থেকে হুড়মুড় করে নেমে “মা মা “ বলে ছুট দেয়, চকলেটটি দেখাবে বলে । বিভা তার পেছন পেছন এসে দেখে, তার মা আর মামা কান্না জুড়ে দিয়েছে। মামীর ও চোখে জল চিকচিক করছে , তাদের কথাবার্তা শুনে বিভা নিজেকে অনেকক্ষণ সামলে রেখেছিল, কিন্তু শেষটাই আর পারলনা ।

শিউলি দেবী কাঁদতে কাঁদতে বললেন - এবার বিভার জন্য কিছু একটা কর ভাই, আমি আজ আছি কাল নেই ; ওকে কে দেখবে বল দেখি ?

মামা বলল - সেই জন্যই তো এখানে আসা, কাল বিকেলে একজন আসবে, বুড়িকে দেখতে। ছেলেটি দেখতে শুনতে বেশ ভালোই। সে ও কোনো একটি স্কুলের শিক্ষক বোধ হোয় । ভদ্র, সভ্য, বেশ শান্তগোছের ছেলে। হাজার খুঁজলে তুমি ওমন একটি ছেলে পাবে গো দিদি ।

বিভা এতক্ষণে তার মামা মামীর এখানে আসার কারণটা জানতে পারল। তবে তাতে তার কিছুমাত্র দুঃখ হয়নি, আনন্দও হয়নি ।

সে এমনিতে কারোকে কোনোদিন ভালোবাসেনি । তাই কারোকে বিয়ে করতে তার যেমন সংকোচ নেই, তেমনই মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে তার আপত্তিও নেই।

মামী বিভার দিকে তাকিয়ে বলল - ওমা, বিভা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে যে ! তোমার ইচ্ছেটাও তো জানাতে হবে।

বিভা বলল - তোমরা যা ঠিক করবে তাইই হবে, তবে বিয়ে যার সাথেই হোক না কেন তাকে আগে থাকতে বলে রেখো যে বিয়ের পর আমি মায়ের কাছেই থাকব।

শিউলী দেবী অবাক হয়ে বললেন - ওই দেখো, মেয়ের কথা শোনো, নতুন সংসার-টংসার ছেড়ে দিয়ে এসে এই রোগা মায়ের সেবা করবে । ও হরি, আমার মরণ কেন হয় না রে !

বিভা বুজে আসা গলায় আওয়াজ বের করে বলল - তোমার মরার খুব ইচ্ছা, তাই না মা ? মর না, আজকেই মর না ! আমার হাড় জুড়োয়- কথাটা বলতে বলতে রাগে গজগজ করতে করতে বিভা রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

মামা ঘর থেকে ডাক দেয় - ও বুড়ি, রাগ করিস কেন? এদিকে আয়। কলি এতক্ষন এদের কথা চুপ করে শুনছিল । যেই বিভাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে, অমনি তার পেছন পেছন রান্নাঘরে চলে যায় ।

মামী বলল – ও দিদি, তুমি আর বেশি কিছু বলোনা । আমি বিভার সাথে কথা বলে দেখছি। ওরও তো একটা মতামত নেওয়া দরকার।

মামী ঘর থেকে বেরিয়ে রান্না ঘরে এসে দেখে বিভা মেঝেতে বসে আটা মাখছে ।আর কলি আটার একটা ছোট গোলা নিয়ে হাতে করে গোল করছে, এদিক ওদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি মনোযোগ দিয়ে দেখছে ।

মামী কলিকে ডেকে বলল – ও, কলি, যা দেখি ; পিমনি ডাকছে তোকে, ঘরে খুব তো বলছিলি "পিমনির কাছে গল্প শুনব, আমার কটা বন্ধু আছে, বলব", যা বলবি যা ।

পিমনি গল্প বলবে! নতুন গল্প! যাই যাই - বলেই অতি উৎসাহের সাথে কলি ছুটতে ছুটতে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বিভার অবশ্য এসব কোনো কথাতেই মন ছিল না। সে নিজের মনে আকাশ পাতাল কীসব ভাবতে ভাবতে নিজের কাজ করে যাচ্ছিল।

মামী বিভার কাছে এসে বসল, তারপর বলল – দাও দেখি বিভা, আমাকে দাও। আমি যে কদিন এখানে আছি, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

বিভা বলল - তুমি কদিনের জন্য আমাদের বাড়ি ঘুরতে এসেছো আর এখানে এসেও খেটে মরবে !

মামী হেসে বলল - খেটে মরতে যাব কেন? সংসারের কাজ যতক্ষণ করব, ততক্ষণ এ ধড়ে প্রাণ থাকবে।

খাটুনি হয় ঘটে, তবে সে পরম আনন্দের। যখন সংসারী হবে, তখন বুঝবে।

- আর সংসারী !! সমস্ত সংসার ঠিক ভালো ভাবেই চলে যাচ্ছে, অথচ আমার আর মায়ের এই ছোট্ট সংসারটা কেমন করে দিন দিন যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

- ও কী কথা বিভা? সংসার আবার কখনও শেষ হয় নাকি? সংসার এক সরলরেখায় চলে। শুধু ধারাবাহিক উপন্যাসের মতো এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে যায়। দিদির হাতে হয়তো আর বেশি দিন নেই, কিন্তু তাই বলে তো তোমার জীবন থেমে যাবে না, সে ঠিক গতিতে বয়ে যাবে, তুমি যদি তোমার জীবনকে সুখী না করতে চাও তবে সেটা তোমার দোষ, অপরাধও বটে। শুধু চোখের জল ঝরিয়ে তো আর জীবন কাটানো যায় না, অমন জীবনে প্রাণ থাকে না। যখন যে পরিস্থিতি থাকবে, তখন সেই পরিস্থিতিকে নিয়েই বাঁচতে হবে।

- কী জানতো মামী ; এখন আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা ভাববার মানসিকতা নেই, অবসরও নেই বলতে পারো। প্রত্যেকটা দিন কী প্রচন্ড চাপের মধ্যে আমার কাটে সে শুধু আমিই জানি I স্কুলে গিয়েও শান্তিতে কাজ করতে পারি না, ভালোভাবে ক্লাস নিতে পারি না I মনের মধ্যে কেমন জানিনা একটা অজানা ভয় হয়, মনে হয় মায়ের কিছু হয়ে গেল না তো !

মামী বলল- সেই জন্যই তো আমরা এখানে এসেছি। এই সময় তোমার, একজনকে পাশে দরকার। দেখো আমরা হয়তো মাসে দু-তিন বার আসতে পারব, এতে তো তোমার পাশে থাকা হলো না। তাই এমন একজনকে দরকার যে প্রতিটা মুহূর্ত তোমার পাশে থাকবে I পরিস্থিতি বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, পরামর্শ দিতে পারবে। তোমার খেয়াল রাখতে পারবে।

-সে না হয় ঠিক আছে I তবে, সে যে আমায় বিয়ে করতে রাজি হবে এমনটা ভাবছো কী করে তুমি?

মামী হেসে বলল - বারে, তোমার এমন ঢালা সৌন্দর্য আছে, দুটি মায়াবি চোখ আছে, চোখে অদ্ভুত এক বেদনা আছে। তোমার থেকে চোখ ফেরায়, কার সাধ্যি? ভগবান যখন তোমায় সৃষ্টি করেছিলেন, বোধহয় সব রূপ তোমার উপর ঢেলে দিয়েছিলেন।

বিভা রেগে গিয়ে বলল - এখানে, হঠাৎ করে ভগবানের প্রসঙ্গ এল কেন? মা তো দেখতে সুন্দর ছিল। এখন রোগে পড়ে তার দশা বদলে গেছে।

- সত্যিই, তোমার সৃষ্টিকর্তা যিনিই হোন না কেন, তিনি তোমাকে ব্যতিক্রমী করে বানিয়েছিলেন বটে।

৩

এখন সন্ধ্যে ৬টা । পাত্রের বাড়ির লোকজন এসেছে, তাদের বসার ব্যবস্থা বিভার ঘরটাতেই করা হয় হয়েছে, বিভার মা তার নিজের ঘরেই শুয়ে আছেন । মামী লোকজনদের জল মিষ্টি দিয়েছে আর মামা তাদের সাথে কথাবার্তা বলছে। বিভা এখন নীচে, তার কাকীমার ঘরে শাড়ি পরছে । কলি আছে বিভার সাথে। ভাবনা অবশ্য আজ এখনও পর্যন্ত থেকে গেছে । এত কাজ, জোগাড়জান্তি মামীকে একা হাতে সামলাতে হবে বলে, সে বলেছিল- “তুমি একা একা পারবে না গো বৌদি আমাকেও থাকতে হবে।” আসলে তার কাজ করাটা ছল মাত্র; পাত্রকে একবার দেখা বা কী কথা হল, না হল এসব ভালো ভাবে জেনে নিতে হবে । তাহলেই আজ রাতে ভাবনা পাড়ার অন্য মহিলাদের কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠবে । সবাই তাকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে কী হল না হল।

ভাবনা কাজের ফাঁকে একবার শিউলিদেবীর ঘরে ছুটে এল - ও দিদি ! শুনেছো কাণ্ডটা একবার !

- কী ? কী হল রে ভাবনা?

- শুন, তবে আর বলচি কি , পাত্রের বাড়ি থেকে পাত্তের পিসে, পিসিমা আর কোন এক বন্ধু এসেচে। অথচ পাত্ত নিজেই আসে নাই মেয়ে দেখতে ।

শিউলিদেবী চমকে উঠে বললেন - সে কীরে ভাবনা ?

- তবেই একবার ভেবে দেখো গো দিদি, পাত্ত কানা না খড়া কে বলতে পারে?

আঃ ভাবনা! তোর সবেতেই একটু বাড়াবাড়ি - শিউলিদেবী রেগে যান । কী হয়েছে ঠিক মতো না জেনেই বড়ো বাজে বকিস। সেরকম হলে ভাই ওদের ঘরে ডেকে আনত না ।কোনো কারণে সে হয়তো আসতে পারেনি, তা বলে তুই ওরকম বলবি?

ভাবনা বলল - আমি কী তাই বলেচি নাকি? আমি শুধু বলছিলাম এমনটা হতে পারে। যাই গো দিদি আমার আবার ঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে। তবে যাই বলগে দিদি পাত্তের পিসিটি কিন্তু বড় মুখরা।

শিউলিদেবী বলল - কেন, তোর এমন কেন মনে হল?

- তবে শোনো। পিসিটি তার গোদা গতরটা নিয়ে খাটের উপর বসে সেই যে পশ্ন আরম্ভ করল, আর থামবার পয়োজনই মনে করে না। তোমার ভাইতো একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। চোদ্দো গুষ্টির নাম, তারা কী কারে, না করে সব তাকে জানতে হবে । আর অমন শুকনো প্যাঁকাটির মতো তার বরটাকে আর ওই ছেলে-মানুষটাকে কথা বলার কোনো সুযোগই তো দিচ্চেনা ।

শিউলিদেবী এবার রেগে গিয়ে বলল- ভালো হয়েছে, তুই এখন যা দেখি এখান থেকে, আমার মাথা খাসনা ।

ভাবনা চোখ গোল গোল করে বলে উঠল - কী বললে আমি তোমার মাথা খাচ্চি ? ভাবলাম তুমি বিছানাগত; তোমারও মন চাইবে এদিকে কী হচ্ছে, না হচ্ছে জানতে, তাই তোমাকে বলতে এলাম, আর তুমি আমন বলচো?

- আমার ঘাট হয়েছে তোর সাথে কথা বলে, এখন তুই যা এখান থেকে ।

যাচ্ছি গো যাচ্ছি - এই বলে ভাবনা আবার রান্নঘরে ফিরে আসে।

মামী বিভাকে উপরের ঘরে নিয়ে আসে। দেখা সাক্ষাৎ হবার পর পাত্রের পিসি বিভাকে জিজ্ঞাসা করে - তোমার নাম বিভা বসু?

বিভা মুচকি হেসে জবাব দেয় - হ্যাঁ।

পিসি বললেন - শোনো মেয়ে, আমার বোনপোর অনেক কাজ কিনা, আজ সে এক দরকারি কাজে আটকে পড়েছে, তাই সে আসতে পারেনি। তোমরা বরং পরে নিজেরা দেখা করে যা ঠিক করার করবে। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তোমার রূপ তো মন্দ নয় দেখছি, তা তুমি আগে থেকে অন্য কারোকে পছন্দ টছন্দ করে রাখনি তো?

বিভা এতটুকু লজ্জিত না হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল - আমি সেরকম মেয়ে নই। আমার যদি কারোকে পছন্দ করে রাখা থাকত, তবে তাকেই বিয়ে করতাম। আমি আমার নিজের কাজ নিয়েই থাকি, বিয়ে করার আমার কোনো প্রয়োজন ছিলনা, তবে শুধু মায়ের মৃত্যুর আগে, তাকে একটু সুখ দেওয়ার জন্য আমি বিয়ে করছি। অবশ্য এতে আমার কোনো দ্বিধাও নেই। কারণ একদিন না একদিন তো আমি বিয়ে করতামই।

পিসি হেসে বললেন- তা ভালো। আমার বোনপো বাপ, মা মরা ছেলে। তোমার শাশুড়ি, শ্বশুরের কোনো জ্বালা থাকবে না, তাকে একটু যাতে ভালো রাখতে পারো তাই এত কথা।

বিভা হেসে বলল - শ্বশুর-শাশুড়ি নেই তো কী হয়েছে, আপনারা তো আছেন। আপনারাই সময়ে অসময়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের মতো দেখবেন, আমরাও দেখব আপনাদের।

পিসি তার ফোলা ফোলা মুখে অদ্ভুত- এক বিকট হাসি হাসতে হাসতে বলল - তা যা বলেছো বাছা !

বিভার মামা বলল - তাহলে কী ঠিক করলেন আপনারা? আসলে বুঝতেই তো পারছেন, বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া যায় আর কী!

পিসি বললেন আমাদের তো মেয়ে পছন্দ হয়েছে। কী গো তোমাদের পছন্দ হয়েছে তো? - পিসে আর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন পিসি।

পিসে আর ওই ছেলেটি বলল - হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় পছন্দ হয়েছে।

পিসি বললেন - তবে আর কী? ওরা দুজনে একদিন দেখা করে কথাবার্তা বলুক, তার পরে রাজি হলে এই মাসের শেষ দিকে বা পরের মাসের মধ্যে একটা ভালো লগ্ন দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে। বুঝতেই পারছেন, সব জোগাড়জান্তি করতেও তো একটু সময় লাগবে। শত হোক বিয়ে বলে কথা, যেমন তেমন করে তো আর দিয়ে দিতে পারি না।

মামা মাথা নেড়ে বলল – হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই।

তা বিভার একখানা ছবি দাও দেখি - পিসি হাসতে হাসতে বলল কথাটা। আমাদের ছেলেকেও তো দেখাতে হবে, আমারা তার জন্য কেমন মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।

মামা বলল - নিশ্চয়, এক্ষুনি দিচ্ছি। মামীকে ডেকে বলল - কী গো, শুনছো? বিভার একটা ছবি এনে দাও দেখি।

কিছুক্ষণ পর মামী বিভার একটা ছবি এনে পিসির হাতে দেয়। আরও কয়েকটা সাধারণ কথাবার্তা হয় তারপর পর পাত্রের বাড়ির লোকজন চলে যান।

৪

পরের দিন সকালে মামা মামীরা ফিরে যায়। কলি বিভার কাছে থাকার জন্য বড়ো কান্নাকাটি করছিল কিন্তু আবার দুদিন পরেই তারা আসবে- এই বলে মামী তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। আসলে দিনের দিকে বেশির ভাগ সময়টাই বিভাকে স্কুলে থাকতে হয়, আর সন্ধ্যের দিকটা রাতের রান্না বান্না করতেই কেটে যায় । ফলে কলিকে বাড়িতে রাখলে তার দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। এখন সামনে আবার বিভার স্কুলে পরীক্ষা, ফলে প্রশ্নপত্র তৈরি করার একটা বাড়তি চাপ।

এমনি করেই কিছুদিন কাটে। একদিন রাতের বেলায় বিভা তার মাকে খাবার খাইয়ে, ওষুধপত্র দিয়ে, নিজে খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের রুমে এসে বসেছে এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠল। আননোন নম্বর থেকে ফোন।

- হ্যালো ?

ফোনের ওপাশ থেকে উত্তর এলো - হ্যালো, আপনি কী বিভা বলছেন?

বিভা বলল - হ্যাঁ, বলছি। আপনি কে বলছেন ?

- আমি সুপর্ণ সেনগুপ্ত ।

নামটা শুনে বিভা চমকে উঠল। নামটা তার চেনা, যে ছেলেটির সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে, সেইই সুপর্ণ ।

খানিক স্তব্ধতার পর বিভা বলল - হ্যাঁ, বলুন কী বলছেন?

সুপর্ণ বলল - আমাকে কোথায়, কখন দেখতে আসবেন সেটা জানার জন্যই ফোন করেছি।

বিভা সুপর্ণর এই দু একটা কথাতেই বুঝে গেছে মানুষটা মন্দ নয়, তার কন্ঠস্বরে অদ্ভুত এক দৃঢ়তা সঙ্গে মিষ্টতার ভাব আছে।

বিভা একটু হেসে উত্তর দিল - আমি আপনাকে কী দেখতে যাব ? আপনি তো আমাকে দেখতে আসবেন ।

সুপর্ণ বলল - কেন আপনি কী আমাকে দেখতে আসতে পারেন না? বিয়ে কী শুধু আমি একা করব? আপনি করবেন না? তাছাড়া আমার তো আপনাকে দেখা হয়ে গেছে।

বিভা বলল - ও ! ছবিতে দেখেছেন বুঝি ? আমি তো ছবির মতে নাও হতে পারি, তাইনা ?

- ঠিকই বলেছেন, ছবির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আপনি । বাস্তবের আপনিকে দেখলে চোখ ফেরানোই যায়না ।

বিভা অবাক হয়ে বলল - আপনি আমায় কোথাও দেখেছেন নাকি?

সুপর্ণ হেসে উঠল - আসলে আপনার ছবি আমি পিসির কাছে দেখেছিলাম, তারপর আগামীকাল একটা কাজের জন্য আমি বাঁকুড়া আসি। সেখানেই বিকেল বেলা আপনাকে একটা বাস থেকে নামার সময় দেখেছিলাম।

- যদি দেখেই থাকেন, তবে আমায় ডাকলেন না কেন?

সুপর্ণ বলল - আপনাকে সেই সময় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তাছাড়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এভাবে আলাপ পরিচিতি করা আমি পছন্দ করি না।

বিভা বলল - আসলে আমি তখন স্কুল থেকে ফিরছিলাম । তা ভালোই হয়েছে, আপনি আমায় যখন দেখেই নিয়েছেন, তখন আপনার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন।

- আর আমাকে দেখার প্রয়োজন নেই বুঝি?

বিভা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল - না । আমি আর কি দেখব বলুন ?

- কেন? আপনি সারাটা জীবন যার সাথে কাটাবেন তাকে একবারও পরখ করে নেবেন না? ধরুন বিয়ের পিড়িতে বসে দেখলেন আমি অতিশয় একটি কুশ্রী লোক, তখন কী করবেন?

বিভা মুচকি হেসে মজা করে বলল - কী আর করব, আপনার থেকে সুশ্রী যাকে পাব, তাকেই বিয়ে করে নেব।

সুপর্ণ পাল্টা জবাবে বলল - তারমানে, আপনার অপশনে আরো অনেকে আছে বলছেন?

বিভা মৃদু হেসে বলল - হুঁঃ; আছে বৈ কী।

সুপর্ণর এবার একটু সন্দেহ হয় - তার মানে? আপনি কী কারোকে?.

- আমি কী?

সুপর্ণ বলল - আপনি কী কারোকে ভালোবাসেন?

- ভালোবাসলে, আপনি কী আপনাকে বিয়ে করবেন না?

সুপর্ণ এবার কঠিন গলায় বলল - না। দেখুন, আপনি যদি সত্যিই কারোকে ভালোবাসেন, তবে আমাকে বলুন। দেখুন আমি বুঝতে পারছি আপনার বাড়িতে সমস্যা আছে, কিন্তু তাই বলে জীবনে এত বড় ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না।

দেখুন, আপনি আমাকে যা ভাববার ভাবতে পারেন। কিন্তু আমি কী সিদ্ধান্ত নেব, না নেব না সেটা আপনি আমায় শেখাতে আসবেন না। আমি ঠিক কী ভুল - কোন সাহসে আপনি আমায় বিচার করছেন? - সুপর্ণর কথাটা শুনে বিভা রেগে যায়। যদি ভাবেন, এখন বা বিয়ের পর আমি আপনার নির্দেশ মতো চলব, তাহলে ভুল ভাবছেন আপনি। মামী বলেছিল আপনি নাকি একজন আদর্শবাদী মানুষ, এই কী আপনার আদর্শবাদ?

সুপর্ণ এবার একটু নরম হয় - কোথা থেকে আপনি কী টানছেন বলুন তো? আমি এমন কী বললাম, যাতে আপনার মনে হল যে আমি আপনাকে বিচার করছি বা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি?

বিভা আরও রেগে ওঠে - ওঃ, এই কথাটা আপনার কাছে এমন কোনো কথাই নয় ?

সুপর্ণ বুঝতে পারে, সে বিভাকে ক্রমশ রাগিয়ে দিচ্ছে - দেখুন, আমি আপনাকে নির্দেশ দিইনি, অনুরোধ করেছি মাত্র। আমি বুঝতে পারছি আপনি খুব ক্লান্ত, আপনার মাথার ঠিক নেই। বিশ্রাম করুন, আমি বরং ফোনটা এখন রাখছি।

- শুনুন... বিভাকে কথাটা বলতে না দিয়েই সুপর্ণ ফোনটা কেটে দিল।

বিভা নিজের মনেই বলতে থাকে - কী! আমি ক্লান্ত ! আমার মাথার ঠিক নেই ! কোন সাহসে আমাকে একথা বলে ? আবার ফোনটাও সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিল। আমিও তো অত সহজে ছাড়ব না।

বিভা সুপর্ণ কে আবার ফোন করে। ফোন তোলার পর সুপর্ণকে কোনো কথা বলতে না দিয়েই বিভা একটানে বলে যায় - শুনুন আমি একদম ঠিক আছি। আপনার মাথার ঠিক নেই, আপনি পাগল। বলেই ফোনটা কেটে দেয়। তারপর ঘরের লাইট নিভিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমোতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। এতক্ষণ ধরে সুপর্ণ যা যা কথা বলেছিল, সেই কথাগুলোই কেবল মাথার মধ্যে ঘূর্ণিপাক খেতে থাকে। ঘুমোনোর জন্য বিভা

অন্য কথা ভাবতে চেষ্টা করে কিন্তু তার ওই কথা গুলো এসে কোনো ভাবনাকেই সম্পূর্ণ হতে দেয়না।

৫

আজ সকালে উঠে থেকেই বিভার মনটা একটু খচখচ করছে । একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সাথে ওরকম ভাবে আচরণ করা তার ঠিক হয়নি - এই ভাবনাই তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে তুলছিল। আজ শিবরাত্রি , ফলে স্কুল যাওয়ার কোনো ব্যস্ততাও ছিল না । সে তার মায়ের ঘরে, খাটে শুয়ে থাকা মায়ের পাশে বসে পূর্ব দিকের জানলা দিয়ে সদ্য ওঠা সূর্যের আলোকিত পরিবেশকে লক্ষ্য করার ছলনা করে গতকাল রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে বার বার নিজের মনের মধ্যে প্রতিফলিত করছিল, তার মা কিছুক্ষন ধরেই কয়েকটা কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো কথাই তার কানে ঢুকল না, হঠাৎ তার মায়ের দুর্বল হাতের একটা ঠেলা খেয়ে তার জাগরণ হয় ।

- বলি, হ্যাঁরে, ঘুমোচ্ছিলি নাকি? কথার উত্তর দিচ্ছিলি না যে?

বিভা বলল - ঘুমোতে যাব কেন, তুমি কী বলছিলে বল?

শিউলিদেবী বললেন - বলি আজ তো তোর ছুটি, একবার সুপর্ণর সাথে দেখা করে আয় না, না হলে তাকেই একবার আমাদের বাড়িতে ডাক, আমি দেখি তাকে একবার।

কথাটা বিভার মাথাতেই আসেনি। মায়ের পরামর্শটাও তার নেহাত মন্দ মনে হয়নি। তাছাড়া এই সুযোগে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়াও যাবে - এই ভেবে বিভা তার ফোনটার অন করেই সুপর্ণকে ফোন করতে গেল। কিন্তু হঠাৎ দেখল তখন সবে সাতটা বাজছে। তাই ভাবল এত সকালে সকাল ফোন করা উচিত হবে না। তিনি কটায় ঘুম থেকে ওঠেন, তাও বিভার জানা নেই, তাই ফোন না করেই ফোনটা তার পাশে নামিয়ে রাখল।

কৈ, ফোন করলি না যে ? - শিউলিদেবী বললেন ।

- এখন সবে সাতটা বাজছে। উনি ঘুম থেকে উঠেছেন কিনা, তুমি জানো নাকি?

- আমি বলছি, সে ঘুম থেকে উঠে যাবে।

- ও! তোমাকে বলেছে বুঝি?

- বলতে যাবে কেন? কাজের ছেলেরা কখনও বেলা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় না, বুঝলি ?

- বাবা ! তার মুখদর্শন না করেই তুমি বুঝেগেলে যে সে কাজের ছেলে?

- কাজের ছেলে না হলে কী সেদিন তোকে দেখতে আসত না ?

- সে কাজ ছাড়া অন্য কারণও তো থাকতে পারে, তুমি কী করে বিশ্বাস করছো?

শিউলিদেবী এবার একটু বিরক্ত হন - শোন আমাকে শেখাতে আসিস না, তোর মামা ছেলেটি সম্বন্ধে মা বলেছে, তা শুনেই বুঝে গেছি এ ছেলে আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়।

বিভা মা কে আরও একটু রাগিয়ে দেওয়ার জন্য বলল - তুমি গোয়েন্দা নাকি যে, তার বর্ণনা শুনেই বুঝে গেলে সে কেমন ?

- গোয়েন্দা নই বটে, তবে গোয়েন্দাদের আমার বেশ লাগত। কত গোয়েন্দা গল্প পড়েছি জানিস? ফেলুদা থেকে শুরু করে শার্লক হোমস, সব গোয়েন্দাদের কাজের ধরণ পর্যন্ত জেনে গিয়েছিলাম। তবে ব্যোমকেশকে আমার বেশ লাগত। তার গল্প পড়তে বসলে নাওয়া, খাওয়া ভুলে যেতাম আর-

- থাক্ মা, তোমাকে আর সকাল সকাল গোয়েন্দাদের হাট বসাতে-হবে না, আর অতই যদি ইচ্ছে, তবে কাল থেকে কোর্ট প্যান্ট পরে হাতে একটা পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে পড়, তোমার গল্পটা বরং আমিই লিখে দেব 'গোয়েন্দা শিউলি দেবী।'

শিউলিদেবী হাহা করে হাসতে হাসতে বললেন - গোয়েন্দা ! আ: মরণ !

বিভা তার মায়ের এই রোগাক্রান্ত মুখে অদ্ভুত ভূতের মতো হাসি দেখে বেশ আনন্দিত হয়। কিন্তু পরের মুহূর্তেই অদ্ভুত এক কষ্ট মেশানো কান্না তার শরীরের শিরায় উপশিরায় আছড়ে পড়ে। এই কয় বছরে এত যন্ত্রণা তার হৃদয় দিয়ে সে সয়েছে যে এখন সহজে আর তার চোখে জল আসেনা। আসলেও তাকে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দেয় না, অন্য কোনো ভাবনা নিজে থেকে ডেকে এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়। সে তাই মৃদু হেসে বলল, তবে তার আগে তোমার মস্তিষ্কটি গোয়েন্দাগিরী করার জন্য প্রস্তুত কিনা, তা পরীক্ষা করতে হবে তো?

শিউলিদেবী বললেন - বেশ তো, তুই সুপর্ণকে একবার ফোনটা করেই দেখনা ?

বিভা তার ফোনটা তুলে নিয়ে সুপর্ণকে ফোন করে। খানিকক্ষণ রিং হবার পর সুপর্ণ ফোনটা তুলেই বলে - হ্যাঁ বলুন। তা সকাল সকাল এই পাগল, মাথা খারাপ মানুষটিকে ফোন করার কারণ জানতে পারি কী?

বিভা বলল - কেন, বিরক্ত করলাম নাকি?

সুপর্ণ বলল - আমি কী তা বলেছি ?

বিভা বলল - তবে কী, এখন সময়টা আপনার কাছে খুবই সকাল বলে মনে হয়?

সুপর্ণ বলল - না, আমাকে সূর্য ওঠার আগে উঠতে হয়। ঘরের যাবতীয় কাজ সেরে বেরতে হয় আটটার মধ্যে। তাই সমস্ত সকালই আমার কাছে বেলা হয়ে যায়। তবে আপনি যতদূর সম্ভব সাড়ে ছটা থেকে সাতটা নাগাদ ওঠেন। তাই এই সময়টা আপনার কাছে সকালই।

-আপনি কী করে রে জানলেন, আমি কটায় ঘুম থেকে উঠি, না উঠি?

সে আমার সাধারণ জ্ঞান মাত্র, আপনি মেয়ে মানুষ, তার উপরে আপনার মা অসুস্থ , আপনাকে স্কুলের কাজের জন্য যত রাতই জাগতে হোক না কেন ওই সময়ই আপনাকে উঠতে হবে, নইলে আবার আপনার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে ।আজ নেহাত ছুটির দিন হলেও এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই আপনি বাড়তি কিছুক্ষণ ঘুমোতে চাইলেও, ঘুম আসবে না। তাই তো ?

কথাটা শুনে বিভা অবাক - বাবা ! আমার চারপাশে তো দেখছি গোয়েন্দার ছড়াছড়ি, শুধু বুঝি আমি একাই এই পৃথিবীতে নির্বোধ হয়ে জন্মেছি।

সুপর্ণ বলল - আপনি কী, তা আপনি জানেন না।

- আপনি জানেন বুঝি?

সুপর্ণ হেসে জবাব দিল - জানি বৈকি। তবে আপনার রাগের তারিফ না করে পারছি না। আপনি যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত চুপ করিয়ে দিতে পারেন, এতে আমার সন্দেহ নেই।

বিভা সুপর্ণর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ করে তাকিয়ে দেখে, তার মা আধশোয়া অবস্থাতে কান ফোনের পিছন দিকে ঠেকিয়ে তাদের কথা শুনছে।

বিভা তক্ষুনি উঠে পড়ে বলল - তুমি চুপ করে এখানে শুয়ে থাক। আমি আসছি - এই বলে বিভা তার ঘরে চলে যায়।

সুপর্ণ জিজ্ঞাসা করল - আপনি আপনার মায়ের কাছে ছিলেন বুঝি?

- হ্যাঁ। আপনি যদি একবার আমাদের বাড়ি আসতে পারেন, তাহলে খুব ভালো হত। আসলে মা আপনাকে দেখতে চেয়েছেন।

- এই জন্যেই বুঝি আমাকে ফোন করেছেন? আমি কাল বিকেলেই বাঁকুড়া থেকে ফিরেছি । কিন্তু ঠিক আছে ,আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি আজ বিকেলেই যাব।

- না না, সেরকম বিশেষ কিছু প্রয়োজন নেই আপনার যদি অসুবিধা থাকে তো...

- আমার অসুবিধার চেয়ে আপনার মায়ের ইচ্ছেটা এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আজ বিকেলেই যাব। তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। আমাকে রাতের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে।

- আপনি থাকেন কোথায়?

- আমি এখন কিছুদিন বর্ধমানে পিসির বাড়ি বেড়াতে এসেছি । তবে আমার থাকার জায়গা অন্য খানে। তবে এখন সেকথা আপনাকে বলব না।

- কেন?

- হয়তো আপনি রাগ করতে পারেন।

- আপনি কী পথে ঘাটে পড়ে থাকেন নাকি? - মজা করে কথাটা বলল বিভা।

- পথে ঘাটে পড়ে থাকতে যাব কেন? পড়ে থাকলেও অবশ্য মন্দ হতনা। এই সংসারে আমার নির্দিষ্ট থাকার জায়গা করে রাখার মতো আর কেউ নেই কিনা ! তাই নিজেকেই একটা জায়গা করে নিতে হয়েছে ।

- থাক থাক এখন ওসব কথা। আপনি এলেই বরং কথা হবে। তবে আপনি আমার রাগের যতই তারিফ করুন না কেন, কালকের ঘটনার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

সুপর্ণ হেসে বলল - আপনাকে ক্ষমা করার সামর্থ আমার নেই। তবে কালকের ঘটনায় আমার এমন কিছু মনে হয়নি যাতে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হয়, বরং আপনার বন্ধু সুলভ ব্যবহারে আমি খুশিই হয়েছিলাম। আজ আপনি ক্ষমা না চাইলে হয়তো আপনার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করতে আমার কোনো সংকোচ হত না।

বিভা কথাটা শুনে খুশি হয় - আচ্ছা ঠিক আছে, অনেক দেরি হয়ে গেল। মাকে এবার সকালের ওষুধটা দিতে হবে। আপনি এলে বাকি কথা হবে। এখন রাখছি।

সুপর্ণ বলল - হ্যাঁ, রাখুন।
ফোনটা রেখে বিভা আবার তার মায়ের ঘরে ফিরে যায়।

৬

এখন বিকেল সাড়ে চারটা বাজে। বিভা, ভাবনার সাথে রান্নাঘরে। ভাবনা চা বসিয়েছে। বিভা ধোয়া বাসন পত্র তাকে তুলে রাখছিল।

ভাবনা বলল, চিনির ডিবাটা দে দেখি বিভা।

বিভা কোনো উত্তর দিল না। যেমন বাসন রাখছিল তেমনিই রাখছে, যেন কোনো কলের পুতুল।

ভাবনা একটু সন্দেহের চোখে জিজ্ঞাসা করল - হাঁ লো, তুই কুথায় আছিস ? শুনতে পাচ্ছিস না, নাকি গো ?

বিভার হঠাৎ চমক ভাঙে – তুমি কিছু বলছো, বৌদি ?

ভাবনা হেসে উত্তর দিল - না, না আমি তো ভূতের সাথে কথা বলচি !

বিভা বলল - আমি হয়তো শুনতে পাইনি।

ভাবনা হাসতে হাসতে বিভার কাছে এসে চিনির ডিবাটা হাতে তুলে নিয়েই বলল - তাকে না দেকেই যদি তোর এই অবস্থা হয়, তবে দেখলে কী হবে?

বিভা কিছু না বলে একটা লজ্জা মিশ্রিত হাসি হেসে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তার ঘরে চলে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ নিচে কলিং বেলের শব্দ শোনা যায়। বিভা সেটা শুনতে পেয়েই ব্যালকনির কাছে ছুটে আসে। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাকে বশীভূত করে ফেলছে যেন।

হাতের তালু থেকে ঘাড় পর্যন্ত সুচের মতো একটা তীক্ষ্ন আবেগ ক্রমশ গাঢ় হচ্ছিল। তার হৃৎপিণ্ডটা নানা শিরা উপশিরার জালে জড়িয়ে যেন আসমানে ঝুলছিল। তার কম্পন তরঙ্গ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। বিভা মুখ বাঁড়িয়ে দেখে তার কাকু বাইরে থেকে ফিরে এসেছে। তার উত্তেজনাটা খানিকটা কমে,

কিন্তু পরক্ষনেই আবার কলিং বেলটা বেজে ওঠে। অতীত উত্তেজনা থেকে বের হবার আগেই সে দেখে একজন সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা ভদ্রলোক

এসেছে। কিন্তু তার মুখ দেখার আগেই বিভা ছুটে তার ঘরে চলে যায়, এই লোকটিই যে সুপর্ণ তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই। সে তার ঘরে গিয়ে সুপর্ণের উপরে উঠে আসার শব্দ শুনতে পায়। দোতলার ঘরে তার কাকুই সুপর্ণকে নিয়ে আসে, তারপরে বিভাকে ডাকে - কইরে, বিভা? বেরিয়ে আয়, দেখ কে এসেছে।

বিভা স্বাভাবিক ভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে, যেন সে কিছু জানেই না। তারপর সে সুপর্ণ দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। তাকে অত্যন্ত ধীর, গম্ভীর এবং জ্ঞানী লোক বলে মনে হয়।

সে সুপর্ণকে প্রথমেই তার মায়ের ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে আগে থেকে রাখা একটি চেয়ার তার মায়ের খাটের সামনে রেখে তাকে বসতে দেয়। সুপর্ণ মৃদু হেসে তার মাকে প্রনাম করে। নিজের পরিচয় দিয়ে সেই চেয়ারে বসে।তার মায়ের সাথে বিভিন্ন কথা বলতে থাকে। কিন্তু বিভার কোনো কথাই কানে ঢোকে না। সে আড়চোখে সুপর্ণর দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে । দেখল তার চামড়ার র ং দুধের সরের মতো, তার উপর সদ্য ওঠা সূর্যের আলো পড়লে যেমন ভাবে উজ্জ্বল করে তেমনি ভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তার শরীর দীর্ঘ , দৃঢ়, মাথার চুল ঘন কালো, সামান্য কোঁকড়ানো । চোখ দুটি বড়ো বড়ো, ডান চোখের মনির ছোট্ট একটি তিল, ভ্রূ জোড়া চোখের মনির মতো নিবিড় কালো এবং বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত , টিকালো নাক, ঠোঁট পদ্মফুলের মতো কোমল, রক্ত বর্ণ। হাতের শিরা উপশিরা গুলি যেন চামড়াকে ভেদ করে বেরিয়ে যেতে চাইছে। আঙুলগুলি লম্বা লম্বা। নখগুলি পরিষ্কার, তাদের রং দুধ আলতার মত। পায়ের পাতা গুলি গায়ের রং এর মতো হলেও কিছু জায়গা দুধের মত সাদা । ওই জায়গাগুলিতে সূর্য তার আদর মাখাতে পারেনি। বাঁদিকের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখে কালো রক্ত জমার দাগ, কোন ভারী জিনিস নখের উপরে পড়েই এই অবস্থা হয়েছে।

যা মা সুপর্ণকে তোর ঘরে নিয়ে যা। শিউলিদেবী বললেন।
হ্যাঁ মা, এই বলে বিভা সুপর্ণকে সম্বোধন করে বলল- আসুন। ভাবনা, বিভা সুপর্ণর জন্য চা নিয়ে আসে সঙ্গে বিস্কুটও ছিল।

সুপর্ণ অল্প হেসে বলল - ক্ষমা করবেন। আমি চা খাইনা।
ভাবনা বলল - আচ্ছা । বলি মিষ্টি খান তো?

- হ্যাঁ, তবে একটার বেশি না।
বিভা বলল - যাও তো ভাবনা বৌদি, প্লেটভর্তি করে মিষ্টি নিয়ে এসো, উনি না খেলে আমরাই খেয়ে নেব।

ভাবনা যেমন হাসতে হাসতে এসেছিল তেমনিহাসতে হাসতে চলে যায় ।

সুপর্ণ বলল - আপনি মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন বুঝি?

- না, মিষ্টি আমার পছন্দ না। আমি ঝাল পছন্দ করি।

- তবে, এই যে বললেন আপনি প্লেট- ভর্তি মিষ্টি খাবেন।

- তা আপনি চা খাবেন না! মিষ্টি খাবেন না! বলি এতো লজ্জা কীসের?

- লজ্জা নয়। আসলে আসক্তি আছে এমন কোনো জিনিসই আমি খাই না, আর মিষ্টি আপনার মতো আমিও ভালোবাসিনা। তবে একেবারেই যে অপছন্দ তা নয়।

বিভা এবার বাচ্চা মেয়ের মতো উৎসাহিত হয়ে হয়ে বলে উঠল, তবে আচার খাবেন? আমের আচার, আমার মামীমা দিয়ে পাঠিয়েছে, খাবেন?

- আপনার কী মাথাখারাপ? এই সন্ধ্যেবেলা আচার! শরীর খারাপ করবে না?

থাক, আপনাকে আর কিচ্ছুই খেতে বলবনা - বিভা রেগে গিয়ে বলল ।

সুপর্ণ হাসে - আহাঃ, আপনি এত রাগ কেন করেন বলুন তো?

- আমি এরকমই। আর ভবিষ্যতেও এরকমই থাকব। তাই বলছি ভালো করে দেখে শুনে নিন।

- কী দেখব?

- আমাকে।

- আপনাকে আমার দেখা হয়ে গেছে।

- হয়ে গেছে! তা ভালো, তবে আর একটা কথা আপনি হয়তো জানেন না।

সুপর্ণ ভ্রু কুঁচকে বলল - কী কথা?

বিভা সুপর্ণর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বলল - আমি নাস্তিক মানুষ। ফলে পুজো আর্চা কোনোদিনই আমি করতে পারব না।

সুপর্ণ হেসে জবাব দিল- তাও আমি জানি।

বিভা খানিকটা রেগে গিয়ে বলল - তাও আপনি জানেন! কী করে ?

সুপর্ণ দেওয়ালের একটা কোনে রাখা কতকগুলো ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে বলল - ওই যে ঠাকুরের সামনে ফুলগুলি শুকিয়ে একেবারে কাঠি হয়ে গেছে, তা দেখেই বোঝা যায় যে এনাদের অনেক দিন পুজো করা হয়নি।

বোধ হয় আপনার মা যখন সুস্থ ছিলেন তখনই শেষ পুজো করা হয়েছে।

বিভা বলল - হ্যাঁ।

সুপর্ণ প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য বলল - তা, আপনি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না?

বিভা মুচকি হাসে - না।

- ভেবে দেখুন, কিছুই কী প্রশ্ন নেই?

- মানুষ চিনতে আমার ভুল হয়না। তাই আপনাকে চেনা বা জানার জন্য, আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

- তা আমাকে কীরকম চিনলেন?

- সে আমি জানলেই হবে। আপনাকে জানানোর দরকার নেই।

- বেশ, বেশ। তা আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে আপনার সেবা করার বা আপনার কাছ থেকে যত্ন নেওয়ার অধিকার আমায় দেবেন তো?

বিভা খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল- শুধুমাত্র যত্ন বা সেবা দেওয়া নেওয়া করার জন্যই মানুষ বিয়ে করে বুঝি?

- যত্ন বা সেবা করার ইচ্ছেটা যদি বিয়ে করার পর সারাটা জীবন প্রত্যেকটা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে থাকে, তবে সেই প্রেম, আপনার অবিশ্বাস করা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেও হার মানিয়ে যায়।

বিভা কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তখনই ভাবনা মিষ্টির প্লেট নিয়ে ঘরে ঢোকে এবং মিষ্টির প্লেটটা সোফার সামনে রাখা টেবিলটার উপর নামিয়ে দিয়ে বাইরে চলে যায়।
সুপর্ণ বলল- এই দেখুন আপনার মিষ্টি ভর্তি প্লেট এসে গিয়েছে।
বিভা বলল- আপনি আগে নিন।
সুপর্ণ মুচকি হেসে বলল- আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হন তবে, আমার জীবন সাথী হিসেবে আপনার মতো একজন মেয়েকে পাওয়ার জন্য, আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হিসেবে এই মিষ্টি প্রথমে আপনি খাবেন।
বিভা হাসল- বেশ, তবে আমিই প্রথমে মিষ্টি খাব আমার বন্ধু আর সেই ভাগ্যবতী মেয়ে যে আপনার সাথে সারাটা জীবন কাটানোর সুযোগ পেয়েছে তাদের জন্য।

এরপর খুব সাধারণ কয়েকটা কথাবার্তার পর সুপর্ণ বিভাদের বাড়ি থেকে চলে যায়। তারপর দু-তিন দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ের ডেট ঠিক হয়ে যায়। পরের মাসে দশ তারিখে বিয়ে ঠিক হয়।

কিছুদিন পর তাদের বাড়িতে মামা মামী কলি আসে । বিয়ের কেনাকাটা, আয়োজন, সবই চলতে থাকে। তার পরে আরও লোক আসতে শুরু করে। বিভার মায়ের সারাদিন লোকজনের সাথে গল্প করেই কেটে যেত, কখনও বা পুরোনো কষ্ট কথা টেনে এনে কিংবা ভবিষ্যতের কথা ভেবে দল বেঁধে কান্না জুড়তো। বিভাও সুপর্ণর সাথে মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলত। তবে তাদের সম্পর্ক সেই প্রথম দিনের মতোই রয়ে গিয়েছিল। বিভা মাঝে মাঝে রেগে গেলেও সুপর্ণ তেমনি ধীর, স্থির , মাধুর্যের সঙ্গে কথা বলত। বিভা এর আগে কখনও কারোকে নিজের মন দেয়নি। তবে এই মানুষটির প্রতি যেন এক দুর্বলতা অনুভব করত। এই মানুষটির প্রতি কীসের এত টান, কীসের যে এত আকাঙ্খা, সে নিজেও জানত না। এটা অল্পক্ষণের নয়; যেটুকু সময় সুপর্ণর সাথে কথা বলত, সেটুকু সময়ের জন্য নয়; সব সময়ের জন্য।

৭

আজ বিভার বিয়ে। গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর বিভা তার ঘরে বসে আছে, তার কিছু বন্ধু বান্ধবের সাথে গল্প করছে। ঘরময় লোকজনের ভিড়, উত্তেজনা, সেই সঙ্গে বাচ্চা ছেলেমেয়ের চিৎকার চ্যাঁচামেচি, হাসাহাসি, দৌঁড়াদৌড়ি, কখনও আবার, পড়ে গিয়ে বা মারামারি করে কান্নার শব্দ কিছুই বাদ ছিলনা।

হঠাৎ করে বিভা শুনতে পায় কিছু মানুষ জোরে জোরে চিৎকার করে ঝগড়া করছে। বিভা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যালকনি দিয়ে দেখে তার মামা একটি মধ্যবয়স্ক নিচু জাতির মহিলার সাথে ঝগড়া করছে। তার মামাকে কিছুজন থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে আর কিছু জন তামাশা দেখছে।

বিভা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায়। দেখে তার মামা জোরে জোরে চিৎকার করে বলছে- পাঁচশো টাকার নাম করে এখন আটশো টাকা চাইতে এসেছো? পাঁচশো টাকার একটা পয়সাও বেশি দেওয়া হবে না তোমাকে এই বলে দিলাম I
মহিলাটি যেন উত্তেজনায় লাফিয়ে লাফিয়ে বলতে লাগল- তবে তুই-ও-শুনে রাখ, পড়ার মুখো মিন্সে, আমিও তোদের আত্মীয়দের খাবারের এঁটো পাতা তুলতে পারব না।

- কী বললে? ভদ্র ভাবে কথা বল বলেদিচ্ছি। তুই-তকারি করছো কেন?

- ছোটোলোক বলে আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে টাকা দেবে না, এ তো কিছুতেই হতে দিব না।

- টাকা কোথায় দিয়নি! তোমার সাথে তো প্রথমেই কথা হয়েছিল, যে প্রতিবেলা পাতা তোলার জন্য পাঁচশো টাকা করে পাবে। আর এখন আটশো টাকা চাইতে এসেছো? এরকম লোভী জন্মে দেখিনি বাবা !

- কী বললি? শালা! আমি লোভী? এই বিয়ে কী করে ভালো ভাবে পার হয়, সে আমিও দেখব, নইলে আমার নামও অলকা নয়।

- একেই তো গায়ে পড়ে ঝগড়া করছো, তার উপর আবার গালমন্দ করছো? ইচ্ছে করছে কষে দুচড় বসিয়ে দিই।

অলকা একপ্রকার ছুটে মামার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল- কী বললি, হারামজাদা, মারবি? আমাকে মারবি? সাহস থাকে তো গায়ে হাত দিয়ে দেখা। তারপর দেখ, আমার স্বামী এসে তোর মুন্ডু কেটে ফেলে দিয়ে যাবে। তারপর জেল যায়, যাবে।

বিভা এবার তার মামাকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে বলল, তুমি ঘরে যাও মামা। আর কোনো কথা বলো না আমি দেখছি।

মামা বলল - তুই আবার কী দেখবি? এই সব ছোটোলোকদের মুখ দেখছিস না, একেবারে কথা দিয়েই গিলে খাবে, রাক্ষসী এক একটা।

কী বললি? অলকা চিৎকার করে উঠল।

বিভা অলকাকে থামিয়ে মামাকে ঘরে যেতে বলে, ততক্ষণে মামীও ছুটে এসেছে। মামী কোনো রকমে মামাকে নিয়ে ঘরে যায়। যে লোকগুলো এতক্ষণ তামাশা দেখছিল তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। বাচ্চা গুলো তাদের খেলা বন্ধ রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

বিভার নিজেকে একটু শান্ত করে নরম হয়ে বলল- অলকা বৌদি, তুমি পাতা তোলার জন্য কত নেবে ঠিক করে বল ?

- দেখ বিভা অত লোকের পাতা আমি আটশো টাকার কমে তুলবো না এই বলে দিলাম।

- সে তো আমাকে বললেই, পারতে। জানতো মামাকেই সব কাজের দেখাশোনা করতে হচ্ছে, তাই হয়তো তোমার উপর একটু রেগে গিয়েছিল কিন্তু আমি তো তোমার মেয়ের মতো। আমাকে বললে আমি কী তোমায় ফিরিয়ে দিতাম?

অলকার রাগ নিমেষের মধ্যে কোথায় যেন উবে যায়, বলল - তা আর বলতে বিভা, আমারও তো খাটুনি কম হয়না বল, তাই দুটো বেশি টাকা চেয়েছি। বেশ তুই না হয় আমায় সাতশো টাকা করে দিস।

- আচ্ছা বেশ। তাই হবে। তুমি যাও এখন খেয়ে নাও গিয়ে।

অলকা এবার একটু হাসল- হুঁ, যাচ্ছি।

অলকা চলে যায়, তারপর বিভা আবার উপরে উঠে এসে ব্যালকনি দিয়ে দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অলকা, তারই কিছু প্রতিবেশী দের বলছে – মামাটার মুখটা যা, কথা শুনলেও কানে আঙুল চাপা দিতে ইচ্ছে করে। হারামজাদা কোথাকার! বিভা

তো বলছে যে আমার দোষ কিছু নেই, তার মামাটাই গায়ে পড়ে ঝগড়া লাগাতে এসেছে।

তাদের প্রতিবেশিনীদের মধ্যে একজন প্রতিবেশীনী বলল তাই নাকি গো অলকা?

– তা আর বলছি কী? তার মামা তো মারামারি শুরু করে দিচ্ছিল আর একটু হলে, তার পরে বিভা এসে তার মামাকে আচ্ছা করে দু চার কথা শুনিয়ে সেখান থেকে তাড়ায়। তারপর আমাকে বলল মামার উপর এই বিয়ে বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে যে কি ভুল করেছি । গায়ে পড়ে মামা শুধু ঝগড়া করতেই জানে। তুমি বলে কিছু বললে না, অন্য কেউ হলে তো যুদ্ধ বাঁধিয়ে ফেলতো। আমি নেহাত মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ বুঝে সব সহ্য করছিলাম নইলে আমিও দেখিয়ে দিতাম আমি কে।

এইসব কথা শুনে বিভা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভাবল- এই মানুষগুলো যেমন অশিক্ষিত, অভদ্র, মিথ্যাবাদী তেমনি আবার ভদ্র, শিক্ষিত মানুষের মতো প্যাঁচ কষতে জানেনা। নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য হয়তো মিথ্যে বলতে পারে, অশ্লীল কথা বলতে পারে কিন্তু একটু ভালবাসা পেলেই নিমেষের মধ্যে সব ভুলেও যেতে পারে।

৮

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়ে এসেছে, বিভা কনের সাজে বসে আছে। তার সাথে দুচার জন বান্ধবী ছিল। হঠাৎ করে মামী ঘরে ঢুকে বাকিদের কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে বলল। বাকিরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই মামী, বিভার পাশে এসে বসতেই বিভা বলল - কী হয়েছে গো মামী, এত চিন্তিত কেন?

মামী কাঁপা কাঁপা গলায় বলল - সর্বনাশ হয়েগেছে রে বিভা !

বিভা আশ্চর্য হয়ে বলল - কী হয়েছে? মামা কী আরও কারোর সঙ্গে ?

- না না, সেরকম কিছু না।

- তবে?

- ভাবনা এই মাত্র আমায় বলল যে, দিদি নাকি সকাল থেকে কিছু খায়নি।

- কী?!

- হ্যাঁরে বিভা। ভাবনা বলছে দিদি নাকি ওকে কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল। ভাবনা নাকি অনেকবার জোর করেছে কিন্তু মেয়ের মা, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কিছু খাওয়া চলবে না, এই বলে কিছু মুখে কিছু তোলেনি , কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকে তার শরীর ক্রমশ খারাপ হচ্ছে

- তুমি কী বলছো কী মামি? মা খাবার খায়নি, তার মানে তো ওষুধও কিছু খাওয়া হয়নি! মা ওষুধের জোরেই বেঁচে আছে, এখন কী হবে বুঝতে পারছো তুমি?

- তাই ই তো বলছি বিভা, একবার চাল, বলে কয়ে যদি খাওয়াতে পারিস।

এরমধ্যে বরযাত্রী এসে পড়ায় একটা তুমুল উত্তেজনা শুরু হয়। বিভা অশ্রুমিশ্রিত গলায় বলল- আমি আর বোধ হয় মাকে বাঁচাতে পারবনা, সব শেষ হয়ে গেল। মা এতক্ষণ যখন খায়নি তখন এখন খেতে বললেও কিছু লাভ হবে না। তার

চেয়ে বরং তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে গেলে, যদি কিছু খাওয়ানো যেত, কিন্তু তাতেও কী তেমন কিছু লাভ হবে?

- অমন কথা বলিস না বিভা এই শুভদিনে অমন কথা বলিস না,

- আমার কিছু ভালো লাগছে না মামী ,আমাকে একটু একা থাকতে দাও ।

- কষ্ট পাস না বিভা, দেখনি সব ঠিক হয়ে যাবে, আমি এখন যাই, দেখি ঠাকুর মশাইকে বলে যদি বিয়েটা তাড়াতাড়ি সারা যায়, মামী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। তার কিছুক্ষণ পর বিভাকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। দুজনের রূপ, শোভা আজ ফোটে পড়ছিল। বিভার অপরূপ সুন্দর, সুসজ্জিত মুখখানার মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা যেন ছাপ ফেলেছিল। তার মধ্যে নিজের বিয়ের আনন্দ বা অনুভূতি কিছুই ছিল না। সুপর্ণ ও বিভার মুখ দেখে বোধ হয় খানিক দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল।

বিয়ে তখন অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে এমন সময় বিভার মামী একটি মাঝামাঝি সাইজের রূপোর থালায়-সিঁদুর নিয়ে আসে। তাদের পরিবারের সকলের বিয়েতেই এই রূপোর থালা করে সিঁদুর নিয়ে আসা হয়। এই রূপোর থালা বিভার বাবার পাঁচ পুরুষ আগেকার।

হঠাৎ করে একজন মধ্যবয়স্ক লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়। সে হাঁপাতে হাঁপাতে সুপর্ণকে উদ্দেশ্য করে বলল – সুপর্ণ, আনন্দ ঠাকুর খুব অসুস্থ। তাকে কিছুক্ষণ আগে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি তোমার বিয়ে বলে তোমাকে খবর দিতে বারণ করেছিলেন কিন্তু এখন অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কথাটা শুনে সবাইকার চোখে বেশ কৌতুহল, ঘরময় এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সুপর্ণ যেন বজ্রঘাতে আহত হয়েছে তার গলা দিয়ে যেন কথা বেরোতে চাইছে না - কী! কী হয়েছে তার?

ভদ্রলোকটি বলল অনেকদিন ধরেই ঠান্ডা লাগিয়ে ছিলেন। তুমি তো এতদিন ছিলে না তাই তার দেখাশোনা করার মতোও কেউ ছিল না। ডাক্তার বলছে তার বুকে নাকি প্রচন্ড সর্দি জমে শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে গেছে।

সুপর্ণ ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিভার মামী পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সুপর্ণ উঠে পড়তেই মামীর হাতে ধাক্কা লেগে সিঁদুর সুপর্ণর পায়ে উলটে পড়ে।স্থানটা চারিদিকে সিঁদুর রাঙা হয়ে যায়।

সুপর্ণ এসব কিছু না লক্ষ্য করেই আগের মতোই এক ভয়মিশ্রিত স্বরে বলল -কিন্তু আনন্দ ঠাকুরের সাথে তো রোজ তো আমার ফোনে কথা হয়, তাঁর শরীরের খবরও নিই, তিনি তো কিছু বলেননি।

- তুমি কী আজ দেখছো আনন্দ ঠাকুরকে? আমরা তার কাছে ছিলাম, আমাদেরকেই কিছু বলেননি I আর তুমি তো দূরে আছো, তিনি জানেন এই সব কথা বললে হয়তো তুমি চিন্তা করবে, তাই হয়তো বলেননি। এখন আর দেরি করো না সুপর্ণ, কোথা থেকে কী হয়ে যায় বলা তো যায় না, তাড়াতাড়ি একবার চল I

সুপর্ণ সেই মুহূর্তে ছাঁদনাতলা থেকে বেরিয়ে যায় I কেউ যে কিছু বলে আটকাবে তার সময়মাত্র সে দেয়নি। বিভা হতভম্বের মতো সব শুনছিল, সুপর্ণকে চলে যেতে দেখে সেও সুপর্ণ পিছন পিছন ছুটে যায়।

সুপর্ণ যখন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যায়, তখন সে সুপর্ণর, হাত টেনে ধরে বলল, আপনি কখন ফিরে আসবেন ? আপনি... আপনি ফিরে আসবেন তো! আমার মায়ের অবস্থা ভালো না।

সুপর্ণ যেন দিশাহারা হয়েগেছে, সে বলল- আমি, মানে, এখন আনন্দ ঠাকুর কেমন আছেন না জানা পর্যন্ত…

- তবে, আমাকে এই টুকু শক্তি দিয়ে যান, যেন আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমার মা কে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। এই বলে বিভা মাটিতে আছড়ে পড়ে, সে সুপর্ণর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। কিন্তু সুপর্ণ কোন দুঃচিন্তায় যে হারিয়ে গিয়েছিলা কে জানে। তার চোখের সামনে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, তাও সে কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না। এমনকি বিভা যে সুপর্ণর পা ধরে কাঁদছে সেটাও সে দেখতি পায়নি আর স্পর্শানুভূতিও পায়নি। সে আর কোনো কথা না বলেই গাড়িতে উঠে চলে যায়। সুপর্ণ চলে যাওয়ায় বিভার মাথা মাটিতে খসে পড়ে, তবুও সে ওঠে না, সেখানে সেরকম ভাবেই পড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। বাড়ির সব লোক তার কাছে ছুটে আসে। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে যায় যে কেউ যে কিছু করবে করবে বা সুপর্ণকে আটকাবার চেষ্টা করবে সে সময়ই পায় না। বিভার মামী এসে বিভার পাশে বসে তার মাথায় হাত দিয়ে বলল- কাঁদিস না বিভা, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। সুপর্ণ কিছুক্ষনের মধ্যেই ফিরে আসবে। আর আমরা তো সকলে- কথাটা শেষ হতে না হতেই ভাবনার ওপর থেকে ডাক শোনা যায় - তোমরা কুথায় গেলে গো সবাই, দিদি কেমন যেন করছে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকো গো, সব্বনাশটা হওয়ার আগে!

কথাটা শুনে সকলে উপরে উঠে আসে, কতক অনিমন্ত্রিত পাড়ার লোকও ছুটে আসে। সকলে ঠেলাঠেলি করে শিউলিদেবীর ঘরে যায়। বিভার মামীও ছুটে। কিন্তু বিভা তেমনি ভাবেই সেখানে পড়ে থাকে।

ভাবনার কথাটা শুনে তার কান্নাটাও থেমে যায়। কিছুক্ষন সে যেন অজ্ঞানের মতো পড়ে থাকে তারপর কোনো মতে তার শরীরটাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে উপরে উঠে যায়। উপরে উঠতেই উজ্জ্বল আলোতে দেখা যায় তার পুরো কপাল জুড়ে, সিঁথিতে সিঁদুর লেগে আছে। কান্নায় তার সমস্ত সাজ নষ্ট হয়ে গেছে, সে যখন সুপর্ণর পা ধরে কাঁদছিল তখন তার পায়ে লেগে থাকা সিঁদুরই বিভার সারা কপাল জুড়ে রাঙিয়ে দেয়। মামী তার দিকে তাকিয়ে তার কাছে সরে এসে আস্তে আস্তে বলল - বিভা, তোর কপালে সিঁদুর এল কোথা থেকে?

বিভা কথাটির তেমন কোনো গুরুত্ব না দিয়ে কেমন যেন একটা মৃদু স্বরে বলল হয়তো আমিই পরেছি। মা বেঁচে আছে তো?

মামী অবাক হয়ে বলল- অমন করে বলিস না বিভা, দেখ এখন যদি কিছু দিদিকে কিছু খাওয়াতে পারিস, আমি খাবার এনে দিচ্ছি।

মামী খাবার আনতে চলে গেলে বিভা তার মায়ের পাশে এসে বসে।

মামা প্রলাপ করে করে কাঁদছে- ও দিদি গো, তোমার কী হলো গো! কিছুক্ষণ পর মামী এসে খাবারের থালাটা বিভার হাতে দেয়- এইনে, দেখ যদি কিছু খাওয়াতে পরিস।

মামাকে উদ্দেশ্য করে বলল- তুমি বাইরে এসো। এভাবে একদম কাঁদবে না, কিছু হবে না, তুমি বরং দেখো ডাক্তার আসতে আর কত দেরী।

এরপর মামা, মামী এবং ঘরের মধ্যে যত লোক ছিল তাদেরকে মামী ঘর থেকে বের করে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

বিভা মায়ের কাছে এসে বসে- মা? ওমা?

শিউলিদেবী ধীরে ধীরে চোখ খোলেন, তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে অল্প হাসেন।

বিভা কিছুটা স্বস্তি পায়। তারপর ধীরে ধীরে তার মাকে কিছুটা খাবার খাইয়ে দেয়। তারপর ওষুধ খাওয়ায়।

বিভা তার মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে। বলল- তুমি এমন কেন করছিলে মা? তুমি জানোনা সময় মত ওষুধ না খেলে তোমার শরীর খারাপ করবে? পেট ব্যথা করবে, পা ব্যথা করবে। তখন বললেও কিন্তু আমি তোমার পা টিপে দেব না, আর ভাবনা বৌদিকেও বারণ করে দেব।

-ও মা?

শিউলিদেবী শুধুমাত্র একটি আঁ আওয়াজ করেন।

বিভা আবার বলতে থাকে- এই সব কিছু পেরিয়ে যাক মা, তারপর তোমার জামাই আর আমি মিলে তোমাকে নবদ্বীপ বেড়াতে নিয়ে যাব। তুমি তো কত বার যেতে চেয়েছো সেখানে। আমি যখন পাঁচ বছরের তখন বাবা, তুমি আর আমি গিয়েছিলাম, মনে আছে তোমার? আমার পুরোটা মনে না থাকলেও কিছু কিছু, মনে আছে। ওমা?

এবার শিউলিদেবী আর কোনো উত্তর দিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে চোখের পাতাও বন্ধ করে দিলেন।

বিভার হৃৎপিণ্ডর মধ্যে দিয়ে যেন দ্বিগুন আয়তনের রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেল। তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, গলার শ্বাসনালিটায় যেন কেউ পাথর ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, তবুও সে একটা ঢোক গিলে বলল - মা? ওমা ? কথা বলছো না যে? তারপর একবার সে ভাবল তার মায়ের বুকটায় হাত দিয়ে দেখবে যে হার্টটা চলছে কিনা, কিন্তু সেটা সে করতে পারল না। তারপর অজান্তেই তার হাতটা শিউলিদেবীর বুকের কাছে চলে যায়। হৃৎস্পন্দন বন্ধ! কিছুক্ষন পর ডাক্তার আসে। বিভা তখনও সেরকম ভাবেই তার মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল। ঘরময় লোকজনের কান্নার রোল পড়ে যায়। ডাক্তার জানিয়ে যায় - সবকিছু শেষ।

৯

পরদিন সকালে শিউলিদেবীকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভা তার মায়ের বিছানাটাতেই শুয়েছিল । কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটো মচকা ফুলের মতো লাল হয়ে আছে। কপালের সিঁদুর চারিদিকে মাখামাখি হয়ে গেছে। বিয়ের বেনারসি টার আঁচলটা কাঁধ থেকে খুলে পড়েছে, ফুলের মালা থেকে ফুল গুলো ছিড়ে গিয়ে খাটের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তার মামী এতক্ষন বসে বসে কাঁদছিল। কলি তার মা কে থামানোর চেষ্টা করছিল, আর একবার করে বিভার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলছিল ও মা? বিভাদিদি অমন করে শুয়ে আছে কেন মা? ও মা? বিভাদিদিকে উঠতে বলনা, ও মা!

মামী উঠে গিয়ে বিভোর পাশে বসে- বিভা, ওঠ মা। তোকে তো বাঁচতে হবে মা ! তুই তো শেষ পর্যন্ত তোর মা কে খুশি করার চেষ্টা করেছিস মা, আর কী চাই বল ! মানুষটা বড় কষ্ট পাচ্ছিল, মুক্তি পেয়েছে ,মা; মুক্তি পেয়েছে। তোর জন্যই তার প্রাণটা আটকে ছিল; মুক্তি পেয়েছে।

দুদিন কেটে গিয়েছে। বিভারও মন খারাপ কিছুটা কমেছে। কিন্তু সুপর্ণর উপর তার সাংঘাতিক রাগ হয়েছে। সে তো আর ফিরে এল না, এমনকি একটা খবর পর্যন্ত নিল না! সে যে সুপর্ণর স্ত্রী , এটা তার মনে পড়ে , শিউলিদেবীর মৃত্যুর পরের দিন, যখন সে স্নানের ঘরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সে যখন সুপর্ণর পা ধরে কাঁদছিল, তখনই যে তার কপালে সিঁদুর লেগে যায় এটা সে বুঝতে পারে। তারপর সে মুখটা ধুয়ে নেয় কিন্তু সিঁথির সিঁদুরটায় জল লাগায় না। এখন তার অবশ্য তার সিঁদুর পরা চলবে না, তাই তার মাথার সিঁদুরটা ফিকে হয়ে এসেছে।

কিছুদিন কাটে। শ্রাদ্ধ-শান্তি পেরোয়, বাড়ির সব লোকও ফিরে যায়। শুধুমাত্র তার মামী আর কলি থেকে গিয়েছিল। তার মামাকেও কাজের জন্য ফিরে যেতে হয়েছে। তবে সারা পাড়া জুড়ে এখনও এই আলোচনাটাই চলছে। এমন অভিজ্ঞতা তারা এই প্রথম অনুভব করছে কিনা ! বিভা তার মলিন পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পরেছে , সেই সঙ্গে শাখা, পলা, সিঁথিতে সিঁদুর।

তার এই সাজ দেখে তার মামী সন্দেহের চোখে জিজ্ঞাসা করল - এখনও কী এই অভিনয়ের দরকার আছে?

-অভিনয়! কী বলছো কী মামী?

-তবে তুই এখন শাখা, পলা, সিঁদুর পরছিস কেন? কুমারী মেয়ে হয়ে কেউ কখনও এমন করে?

- কুমারী কেন হতে যাব? আমি তো এখন বিবাহিত।

- জানি রে বিভা, তোর মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। কেন যে সুপর্ণর সাথে তোর সম্বন্ধটা দেখতে গেলাম? কিন্তু - তুই ভাবিস না, তোর মামাও আচ্ছা করে দুচার কথা শুনিয়ে দিয়েছে।

- দুচার কথা শুনিয়ে দিয়েছে মানে? মামা কাকে কী বলেছে?

- দিদি যেদিন রাতে মারা গেল, সেদিন তোর মামা, সুপর্ণকে ফোন করে বলেছিল সে যেন তার মুখ আর আমাদের না দেখায়। আমরা তোর সাথে অন্য কারোর বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

বিভা যেন আকাশ থেকে পড়ে- কী?! মামা এরকম বলেছে? তুমি আটকাওনি ?

- আমি কেন আটকাবো? দিদি কত আশা নিয়ে বেঁচে ছিল, কিন্তু মরে যাওয়ার আগে সুপর্ণ যখন এলো না, তখন তোকেই মিথ্যে সিঁদুর পরে দিদির কাছে যেতে হল। মারা যাওয়ার আগে কত বড় মিথ্যাচারটা হল মানুষটার সাথে! যে বিয়ে করতে করতে সব ছেড়ে পালাতে পারে, সে আর যাই হোক কোনো ভালো মানুষ হতে পারে না। যদি পরে ফিরেও আসত, তবে কোন ভরসায় তার সাথে তোর বিয়ে দিতাম বলতে পারিস? তোর মামা যা বলেছে, যা করেছে, একদম ঠিক করেছে।

- এ তুমি কী করলে মামী? আমি শুধু শুধু তার উপর রাগ করে বসে আছি। এত ঘটনা ঘটে গেছে আর আমাকে জানাওনি পর্যন্ত। না জানি কত কষ্ট পেয়েছে মানুষটা।

- তুই এখনও তার কষ্টের কথা ভাবছিস, আর সে যে বিয়ের পিড়ি থেকে উঠে পালাল, তার বেলা?

- তোমরাও তো সেখানে ছিলে মামী। আমার মা যেমন অসুস্থ, তেমনি তারও কোনো আপনজন অসুস্থ ছিল, তাই তাকে যেতে হয়েছে। আর সিঁদুর, আমি পরেছি এ তোমায় কে বলল?

- কেন? তুই তো সেদিন বললি।

- তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। কী বলতে কী বলে ফেলেছি। সিঁদুর আমি তার কাছ থেকেই পরেছি মামী।

মামী বিভার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলনা- মানে? কী বলছিস কী?

- হ্যাঁ, তোমার হাত থেকে সেদিন সিঁদুরের থালা উলটে সুপর্ণর পায়ের উপর পড়ে গিয়েছিল। তারপর আমি যখন তার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলাম তখনই সেই সিঁদুর আমার সিঁথিতে লেগে যায়। তার হাত থেকে সিঁদুর পরার সৌভাগ্য আমার হয়নি । হয়তো হতে পারত কিন্তু তোমাদের জন্য সেটুকু সম্ভাবনাও মিথ্যে হয়ে গেল। কিন্তু আমি তার স্ত্রী, তার কাছ থেকে সিঁদুর পরেছি এটাই বড়ো কথা।

তার মামী এতক্ষণ আশ্চর্য হয়ে বিভার সব কথা শুনছিল, তরপর বলল – এতকিছু কাণ্ড হয়ে গেছে আর আমাকে কিছু জানাসনি তুই? অদৃষ্ট তোর সাথে যে কী খেলা খেলছে কে জানে! আর আমরাও ভুল বুঝে কী মস্ত বড় একটা অপরাধ করে ফেললাম। তা না হলে তোর আজকের জীবনটা হয়তো অন্যরকম হতে পারত। আচ্ছা এখন কী কিছুই করা যায় না?

- জানিনা, তবে আমি সুপর্ণকে ফোন করে সব জানাব। এরপর যা হওয়ার হবে। আমি বড় ক্লান্ত হয়ে উঠেছি মামী, আর নিতে পারছিনা। এরপর জীবনটাকে ভাগ্যের হাতে তুলে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চায়। বাবার মৃত্যু দেখেছি, মায়ের মৃত্যু দেখেছি, আর কত কষ্ট সহ্য করব বলো দেখি? আর দেখো, যাকে মন প্রাণ দিয়ে নিজের অজান্তেই ভালোবাসলাম, যাকে অবলম্বন করে বাঁচার সুযোগ পেলাম, আজ তার স্ত্রী হয়েও সেই পরিচয় কেউ জানল না। এমনকি সেও না। কি হাসির কথা না !

১০

প্রায় এক মাস কেটে গিয়েছে। আজ সকালে বিভা নবদ্বীপ যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। সকাল পাঁচটা চল্লিশে বাস। ঘরে থাকতে আর তার ভালো লাগছিল না। দিনের বেলাটা স্কুলেই কেটে যেত। কিন্তু বিকেল থেকে সেই একঘেঁয়ামি মন খারাপটা কিছুতেই কাটত না, তাই খানিক স্বস্তি পেতে এই বেড়াতে আসা। প্রথমে ভেবেছিল পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রে বেড়াতে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নবদ্বীপে বেড়াতে আসাই ঠিক করে, কারণ তার মা মারা যাওয়ার দিন সে মায়ের শেষ সময়ে এখানে ঘুরতে আসা নিয়েই গল্প করছিল। সে খুব ছোটোবেলায় এসেছিল তার বাবা, মার সাথে। আজ তারা কেউ নেই। তাছাড়া ভারতে, শুধু ভারতে কেন, গোটা বিশ্বে এক নতুন রোগের দেখা দিয়েছে। ভাইরাস আক্রান্ত রোগ, কোরোনা ভাইরাস। হাজার হাজার লোক আক্রান্ত হচ্ছে । ভারতে এখনও তেমন বেশি কেউ আক্রান্ত হয়নি। তাই বেশি দূরে কোথাও বেড়াতে যেতে চায়নি বিভা। একটা মাত্র দিনের আর একটা রাতের জন্য ঘুরতে যাচ্ছে সে।

এগারটা নাগাদ বাসটা নবদ্বীপে পৌঁছালো। বাস থেকে নেমে, বিভা ইস্কন মন্দিরে দিকে যেতে শুরু করল । বাসস্টাণ্ড থেকে বেশি দূরে না মন্দির। কিন্তু আজ দিনটা বাড়াই বাজে । সকাল থেকেই মেঘ করে আছে। একটা ভ্যাপসা গরম, সেই সঙ্গে অসংখ্য লোকজনের ভিড়। বিভা মন্দিরের ভিতর ঢোকে। সেখানে তেমন কোনো ভিড় নেই। দশ বারো জনের মতো লোক সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। বিভা মন্দিরে ঢুকে একবার চারিদিকটা ঘোরে, মন্দিরের মধ্যেই একটা দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়ে। যে শান্তির আকাঙ্খায় সে এখানে এসেছিল তার বিন্দু মাত্র খুঁজে পাচ্ছে না। সে সেখানেই যায় যেন এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ খুঁজে পায়, স্বাস্থ্যকর হলেও অস্বাস্থ্যকর । হৃদয়টা যেন তার কোনো অনুভূতিতেই সাড়া পায় না।

বিভা বসে বসে কীসব আকাশ পাতাল ভেবে চলেছে এমন সময় একজন পুরোহিত মন্দিরে ঢোকে। দেখে মন্দিরের দেওয়াল ঘেঁসে সাদা রঙের সাধারণ চুড়িদার পরা একটা বিবাহিত মেয়ে বসে আছে। তার চোখে ক্লান্তির ছাপ, যেন চোখের পলক পড়ছে না, সব হারিয়ে সে যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে।

ওই পুরোহিত বিভার কাছে গিয়ে বললেন- তোমার কী হয়েছে, মা?

অধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ একটি গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বিভা চমকে ওঠে। কথার উত্তর না দিয়ে বিভা লোকটির দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। দেখে লোকটি একটি গেরুয়া ধুতি পরে আছে আর গায়েও একটি নামাবলি জড়ানো। গায়ের রঙ সাধারণ, তবে বেশ উজ্জ্বল, চোখে মোটা লেন্সের চশমা, তার মাথায় পাকা চুল দেখে বয়স পঞ্চাশ-ষাটের কাছাকাছি মনে হলেও তার শরীর জুড়ে টানটান চামড়া দেখে সে বোঝাবার উপায় নেই। শিরদাঁড়া সোজা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করেন- কী হয়েছে তোমার?

বিভা মৃদু হেসে বলল - কীছু হয়নি তো। আপনি কে?

- আমি এই মন্দিরের সামান্য পুজারি মাত্র। তোমাকে দেখে মনে হলল তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, শরীর ভালো আছে তো? তুমি করেই বলছি, কেমন?

বিভা মুচকি হাসল- হ্যাঁ, নিশ্চয়। আসলে আমি বাঁকুড়া থেকে আসছি তো, তাই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

পুজারিও হাসলেন- তাই কী? হবে হয়তো! তোমার সাথে আর কেও আসেনি?

- না, আমার কেউ নেই।
পুজারি এবার একটু অবাক হলেন- কেউ নেই মানে?

- এই দুনিয়ায় কেউ নেই।

- বাবা, মা?

বিভা আবার বলল- কেউ নেই।

পুজারি খানিক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন – তুমি তো বিবাহিতা, তোমার স্বামী, শ্বশুর বাড়ি?

বিভা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল – কিচ্ছু নেই, কেউ নেই।

পুজারি একটু সন্দেহের চোখে প্রশ্ন করলেন – তারা কী তোমায় ঘরে নেয় না?

– আমার শুধু স্বামী আছে, শ্বশুরবাড়ি নেই। থাকলেও আমি জানিনা। তিনি আমাকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু তিনিই সেটা জানেন না।

পুজারি বিভার কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। সে যাক্, তুমি এখানে ঘুরতে এসেছ ? নাকি অন্য কোনো কাজে ?

বিভা বলল - ঘুরতে।

- বাঃ! এ তো ভাল কথা । তবে এখন তোমার ভ্রমণে মনোযোগ করা দরকার। এমন একা একা বসে আছো কেন? জানতো এখানে আরো অনেক পুরনো মন্দির আছে। তাদের দর্শন করো । নৌকো করে নদী ভ্রমণ করো।

বিভা একটু রেগে গিয়ে বলল – বসে আছি, আমার মন।

পূজারী একটু হাসলেন, তারপর বললেন- জীবটাকে হেলায় ফেলায় পার করলে চলবে ? ভাবনাগ্রস্ত হয়ে আর মন খারাপ করে জীবনে বেঁচে থাকা যায় ?

বিভা আর কোনো কথার উত্তর দিল না । পুজারি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বিভা আর তার সাথে কথা বলতে চাইছে না দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর বিভা বেরিয়ে পড়ে। বিভিন্ন মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখে, অতিব অনিচ্ছার সঙ্গে। রাতে একটা লজ ভাড়া নিয়ে ছিল। পরদিন সকালে লজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসার জন্য বাস ধরতে যায়। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে শোনে পুরো দেশে লকডাউন জারি হয়েছে। ফলে কোনো বাস, ট্রেন, গাড়ি চলবে না, কোরোনার প্রকোপটা বড় বাড়ছে যে! বিভা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গাড়ির সন্ধান পায় না। যে লজে ছিল সেখানে আবার ফিরে যায় । কিন্তু সেখানেও সব রুম বুক হয়ে গেছে, তাছাড়া বেশি দিন সেখানে থাকা যাবে না । কারন লজও বন্ধ করার নির্দেশ আছে। বিভা মন্দিরে ফিরে এসে দরজার পাশে বসে। এখন সে কী করবে, শুধু এই কথাই ভাবতে থাকে। প্রয়োজনে পড়ে যে ঠাকুর ডাকবে, তাও তার উপায় নেই। সে নাস্তিক মানুষ, ভগবান মানে না। ফলে অহেতুক পাগলের প্রলাপ বকতে সে চায়না। তার কাছে টাকা ছিল, এমনকি একটা এটিএম কার্ডও ছিল। কিন্তু পোষাক আসাক দু-তিনটির বেশি ছিল না।

কিছুক্ষন পর কালকের পুজারিটি মন্দিরে চাবি দিতে আসে। সমস্ত ধর্মীয় জায়গাও বন্ধ করার নির্দেশ আছে। পুজারিটির হঠাৎ বিভার দিকে চোখ পড়ে। তিনি বিভার কাছে এসে বললেন- তোমার ঘর কোথায় ? তুমি ফিরে যাবে না ?

বিভা পুজারির দিকে ফিরে তাকায়, তাঁর প্রতি আর তার রাগ নেই- আমার বাড়ি বাঁকুড়ায় । বাস, ট্রেন সব বন্ধ । এমনকি কোনো প্রাইভেট গাড়ি অবধি পাচ্ছি না। কেউ যেতে চাইছে না এত দূরের রাস্তা ।

- তবে কী করবে এখন? আছো কোথায়?

- আজ সকাল পর্যন্ত একটা লজে ছিলাম, কিন্তু সেখানেও কোনো রুম ফাঁকা নেই। আর এখন আমার থাকবার কোনো জায়গা নেই।

- কেন? অন্য কোথাও গিয়ে একবার কথা বলে দেখো। টাকা পয়সা আছে তো?

- তা আছে। তবে কোথাও গিয়ে লাভ নেই, কোনো লজেই নতুন কারোকে ঢোকাবে না।

- তাহলে, কী করবে এখন কিছু ভেবেছ ?

বিভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল - জানিনা।

পুজারী একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন- আমার একটা জায়গা জানা আছে। যাবে?

পুজারীর কথা শুনে বিভা যেন আলোর দিশা দেখতে পায়- কোথায়?

- এখান থেকে খানিকটা দূর। তবে হেঁটে যাওয়া যাবে , যাবে ?

- আর উপায় কী! চলুন।

বিভা ভাবে এই লোকটা মন্দ নয়, ফলে তাকে বিশ্বাস করে যাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া এখন সে পথে ঘাটে আর কোথায় পড়ে থাকবে ?।

বিভা তার ব্যাগপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিছুটা পথ হেঁটে যাওয়ার পর পুজারী জিজ্ঞাসা করেন- তোমার নাম কী মা?

- বিভা বসু।

- আচ্ছা। বেশ । আমার নাম আনন্দ দাশগুপ্ত। তোমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু কোনো লজ বা ভাড়া ঘর নয়।

বিভা খানিক চমকে গিয়ে বলল - তবে?

পুজারী হেসে বললেন - ভয় পেলে নাকি, মা? আমরা যেখানের যাচ্ছি, সেটা একটা আশ্রম। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা থাকে, পড়াশুনো করে। তবে তারা কেউই উঁচু জাতি বা ধনী ঘরের নয়। সকলে ভিখারি, ভিখারিনির সন্তান।

-তাই নাকি?

- হ্যাঁ। আমার এক ছেলে আছে। তার উদ্যোগেই এই আশ্রম করা হয়েছে। নইলে নবদ্বীপের মতো জায়গায় কী তুমি ভিখারীর অভাব অনুভব করতে?

বিভা খানিক আশ্চর্য হয়, এমন ও কোনো জায়গা আছে বলে তার আগে কোনো ধারণাই ছিল না।

প্রায় মিনিট পনের পথ হাঁটার পর তারা একটা আশ্রামে এসে পৌঁছায়। মস্ত গেটের উপরে আশ্রমের নাম লেখা “সুলেখা ভবন”। গেটের ভিতরে ঢুকে বিভা দেখে জায়গাটা বেশ বড়। চারদিকে পাঁচিল ঘেরা বড় জায়গা, গেট থেকে সোজা একটা

কাঁকর বিছানো পথ চলে গেছে। চারিদিকে গাছগাছালিতে ভর্তি, একদিকে পরপর তিনটে দোতলা ঘর, অপর একদিকে একতলার বেশ কয়েকটি ঘর অনেকটা জায়গা জুড়ে, তার মাঝখানে ফাঁকা মাঠ। এটাই হল বাচ্চাদের পড়ার স্কুল। দূরে কাঁকরের রাস্তাটা যেখানে গিয়ে মিশেছে সেখানে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সেটাও দোতোলা, প্রাচীন আর অনেক বড়।

এমন সময় হঠাৎ এক মহিলার মিষ্টি সুরেলা আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে শব্দটা ক্রমশ স্পষ্ট আর জোরালো হতে থাকে, বিভা বুঝতে পারে, কেউ গান গাইছে। গানটা এরকম-

ওরে ও অভাগিনী, রে-

তোর প্রাণনাথ, আইল না রে-

তবে মিছে মিছে, ডাকিস কেন রে-

ওরে ও আঁচলা, রে

একটিবার কান পেতে শোন রে-

কইছে বাতাস, সে তো তোর নয় রে -

ওরে ও অচলা, রে-

ও হরি, তোর .....

হঠাৎ করে মেয়েটি বিভা আর আনন্দকে দেখে গান থামায়। চব্বিশ - পঁচিশ বছরের মেয়েটি কৃষ্ণ বর্ণের । তার ফ্যাকাসে ঠোঁট আর কালো কালো চোখদুটি শরীরের যেকোনো অঙ্গের থেকে সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত, তার মুখখানা গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট। দুই ভ্রুর মাঝখানে চন্দনের তিলক টানা এবং তা নাকের মধ্যাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পরনে সাধারণ একটা গেরুয়া রঙের শাড়ি। শাড়িটা খুঁট ফেলে পরা। গলায় একটা তুলসির মালা। গলার মাঝখানেও চন্দনের একটি ফোঁটা, ডান হাতে একটি লাল ধাগা বাঁধা, বাঁ হাতে কিছু নেই। তার খোলা চুলের গাছা কোমর অবধি ঝুলছিল। সে খানিক্ষণ বিভার দিকে বিহ্বল হয়ে তাকায়, হয়তো তার রূপে মোহিত হয়ে পড়েছিল। তারপর আনন্দের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল- এ আপনি কাকে আনলেন ঠাকুর?

- এ হল বিভা বসু। নবদ্বীপে বেড়াতে এসেছিল। কিন্তু সারা দেশে লকডাউন হওয়ায় আর বাড়ি ফিরতে পারেনি, তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সে এখানেই থাকবে। ওদিকে ঘর গুলো ফাঁকাই আছে তো নাকি?

মেয়েটি বলল – হ্যাঁ, ঠাকুর।

আনন্দ ঠাকুর বিভার দিকে তাকিয়ে বললেন- এ হল অচলা। এই আশ্রম দেখাশোনা করে। তুমি ওর সাথে যাও, তোমার থাকার জায়গা দেখিয়ে দেবে আর এখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিভা একটু লজ্জিত হয়ে বলল- কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব। টাকা পয়সা কত কী লাগবে...

বিভার কথা শেষ হতে না দিয়েই আনন্দ ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন- টাকা আবার কী দেবে? এই আশ্রমে সকলে থাকে, খায়, কিন্তু কোনো টাকা নেওয়া হয় না। এটা ছোট ছোট বাচ্চাদের আশ্রাম। তবে একান্তই যদি কিছু দিতে চাও তবে এখানে যে বাচ্চাগুলো থাকে, তাদের জন্য কিছু করে যেও।

বিভা নম্রতার সঙ্গে বলল- বেশ তাই হবে।

আনন্দ ঠাকুর অচলাকে বললেন- যা অচলা বিভাকে ঘরে নিয়ে যা। আমি ছেলেমেয়ে গুলোর কাছে যাচ্ছি।

এরপর আনন্দ ঠাকুর সেই স্কুলটার দিকে চলে যায় আর বিভাও অচলার পিছন পিছন যেতে থাকে।

১১

কিছুটা গিয়ে বিভা দেখে একটা বড়ো আমগাছের পাশে একটা দোতোলা ঘর। ওই আগের ঘর গুলোর মতোই। তবে এই ঘরটা আগে থেকে দেখা যায়নি। ঘরটার কিছুটা আগেই স্কুলের পরিধিটা শেষ হয়ে গেছে। আর এটাই যে এই এই আশ্রমের শেষ ঘর, সেটা কিছুটা দূরের ঘন গাছগাছালি, আগাছা দেখেই বোঝা গেল। তবে ঘরটার বাঁ পাশে একটা ফাঁকা জায়াগা দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে পেছনে একটা বড় পুকুর আছে। ঘরের ভিতরে ঢুকে অচলা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়, বিভাও যায় তার পেছন পেছন। সে চারিদিকে শুধু চোখ মেলে মেলে দেখতে থাকে।

দোতলায় উঠে গিয়ে বন্ধ দুটো ঘরের মধ্যে সামনের একটি ঘরের দরজা খুলে দিয়ে অচলা বলল- এই দেখো দিদি, এইটে তোমার ঘর এখন থেকে।

বিভা হেসে বলল- দিদি কেন বলছো? তোমার বস কত?

- তা তো ঠিক জানি না, ওই পঁচিশ হবে বোধ হয়।

- তাহলে তো তুমি আমার সমবয়সি। দিদি বলো না, অন্য কিছু বল। না হয় নাম ধরেই ডেকো।

অচলা হাসল- না, তা কী হয়? তোমাকে নাম ধরে ঢাকতে পারবনা।

- কেন পারবে না?

- তা জানি না, তবে তুমি যদি বল তোমাকে সই বলে ডাকতে পারি?

- সই! কেমন একটু পুরোনো পুরোনো ঠেকছে না?

-পুরোনো, কিন্তু মন্দ নয়।

- বেশ, তাই বল, আমিও তোমায় সই বলেই ডাকব।

-তা হলে তো ভালোই হয়। আমি নীচেই থাকি, তোমার কোনো দরকার হলে, আমায় ডেকো, কেমন? আর একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমার ঘরটা একটু পরিষ্কার করে দিই। অনেক দিন হয়ে গেল ঘরটা বন্ধ ছিল তো।

- ঠিক আছে, আমরা দুজন মিলে পরিষ্কার করে নেব। আমরা দুজন তো সই তাই না? আচ্ছা তখন তোমার গান শুনছিলাম। তুমিতো বেশ গাও!

অচলা একটু লজ্জা পায়- না না তেমন কিছু না। আগে গান গাইতে গাইতে ভিক্ষে করতাম, তারপর ঠাকুরের আশ্রয় পেয়ে এই আশ্রমের সেবা করছি। তবে গান ভুলি নাই। নিজেই গান বাঁধি আবার নিজেই গাই। শোনবারও কেউ নেই আর মন্দ বলারও কেউ নেই।

- তবে আমি যে কটা দিন এখানে আছি, সেকটা দিন শুনিও। তবে সাবধান! খারাপ হলে কিন্তু গালমন্দ করব।

অচলা হি হি করে হাসতে হাসতে বলল- তা করগে, এ জীবনে কিছু কম সইনি। চল ঘরটা পরিষ্কার করে দিই। তারপর তুমি স্নান সেরে নাও, তারপর তোমাকে বাচ্চাগুলোর সাথে দেখা করাতে নিয়ে যাব।

ঘর পরিষ্কার করা হয়ে গেলে, বিভা স্নান সেরে ঘরে এসে জানলাটার কাছে দাঁড়ায়। এমনিতেই মেঘলা মেঘলা ছিল তাই জানলা দিয়ে পিছনের পুকুরের দিক থেকে ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বইছিল। অচলা কিছুক্ষণের জন্য অন্য একটা কাজে গিয়েছিল। সে আবার ফিরে এল - কী গো সই, স্নান হল?

- হ্যাঁ।

- সত্যি তোমার রুপখানা ফেটে পড়ছে !

বিভা অচলার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে আবার জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়
- সে থেকেই বা কি আর না থেকেই বা কি ?

অচলা অবাক হয়- কেন?

- নিজের রুপ নিয়ে আর নিজে নিজে কী করব?

- কেন, তোমার স্বামী?

- সে থেকেও নেই।

- তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না সই। চল যেতে যেতে কথা হবে।

- হ্যাঁ, চল। তারা নীচে নেমে যায়, তারপর বিভা তার কথা গুলো চাপা দেওয়ার জন্য অচলাকে এটা কী, ওটা কী, জিজ্ঞাসা করতে থাকে।

-হ্যাঁ গো এখানে কতজন ছেলেমেয়ে পড়ে?

- পঞ্চাশ-ষাটের মতো হবে।

-তারা কী এখানেই থাকে?

-হ্যাঁ।

- আর তাদের বাবা মা?

-আছে। তারা এই নবদ্বীপেই কোথাও ফলমূল বেচে, কোথাও বা সাজগোজের দোকান দেয়, দোকানে কেরানির কাজ করে, এইসব আর কি ।

-তবে আমি যে শুনেছিলাম তারা নাকি ভিখিরিদের ছেলে মেয়ে?

-হ্যাঁ, তা ছিল বটে তবে তাদের এই সুখময় জীবন যদু দাদা নিজের হাতে গড়েছেন।

- যদু দাদা!

- হাঁ।

- সে কে?

- সে অনেক কথা। ওই সে শেষ দিকে দোতালা বড় বাড়িটা আছে না? ওটা

তাদেরই বাড়ি।

- এখন তিনি বাড়িতে আছেন?

- না। এখন তিনি ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছেন, তবে এখন ছুটি হবার সময় হয়ে এসেছে। এখন এমন নিস্তব্ধ দেখছো তো, জায়গাটা। কিছুক্ষণ পরেই কোলাহল টা একবার দেখবে।

- উনি কী একাই পড়ান?

- না, চন্দ্র দাদাও পড়ান। আর ঠাকুরও মাঝে মাঝে পড়ান।

বিভা আবার অবাক হয়- চন্দ্র দাদা!

- হাঁ, চন্দ্রনাথ। যদু দাদার বন্ধু আর ঠাকুর হল আনন্দ-ঠাকুর।

আনন্দ ঠাকুর নামটা আগে থেকেই বিভার বার বার শোনা শোনা মনে হচ্ছিল, কিন্তু কোথায় শুনেছে সেটা সে মনে করতে পারছিল না।

বিভা একটু আমোদিত ভাবে বলল- এখন একটা গান ধরো সই।

অচলা বলল - আ মরল যা। এখন গান! তবে বলছো যখন, তখন গাইছি, তবে একটু ভাবতে দাও।

খানিক চিন্তা করে অচলা গান ধরে-

ও হরি, তুই তো এলিনা,
তাই বলে কি সই পাঠালি গা ?
থাকতে দিলি কালো ঘরে,
বাঁধতে দিলি আমার খুঁটে -
শেষে আঁচলাটাই তামার, হারিয়ে গেল রে।

তার রূপের ছটায়, আগুন লাগল তৃণে
মরাল হারিয়ে গেল, গভীর জলে
আমোদ লাগল এই অচলার বুকে-
ও হরি তুই তো এলিনা
তাই বলে কি সই পাঠালি গা ?

মেঘে মেঘে ভুবন ঢাকলিরে
এই দুখিনীর দুঃখটাও কী তবে কেড়ে নিলিরে
আর ছলনা করিস নারে
এই অধমের, অচলার সাথেরে
উল্লাসে আর হারিয়ে যেতে দিস না আমায় রে
তোর প্রাণ সঙ্গীকে তুইই ধরে রাখরে।
ও হরি তুই তো এলি না,
তাই বলে কি সই পাঠালি গা?

বিভা মন দিয়ে অচলার গান শুনছিল। অচলা গান থামাতেই বিভা চেয়ে দেখে চারিদিকে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে গুলো ছোটাছুটি করছে। তাদের বেশিরভাগেরই বয়স দশ বারো বছর। পাঁচ ছয় বছরেরও আছে। এরই মধ্যে আনন্দ ঠাকুর দেড় দু বছরের এক শিশুকে কোলে নিয়ে উপস্থিত হলেন। আনন্দ ঠাকুর বিভাকে জিজ্ঞাসা করলেন- কী মা, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

বিভা অল্প হেসে বলল- না না। একদমই না।

ওই দেড় দুবছরের বাচ্চা ছেলেটি তার হাত সামনের দিকে বাঁড়িয়ে অচলাকে দেখিয়ে বলল - দেক্ অতলা দেক্, যতু দাদা আমায় তত দিয়েতে।

অচলা গালে হাত দিয়ে বলল- ওমা, তাই নাকি? যদু দাদা তোমায় চচ দিয়েছে?

বাচ্চাটি বলল - হুঁঃ।

অচলা বিভাকে দেখিয়ে বলল- ও মৃণাল, এই দেখ এটা একটা নতুন দিদি।

মৃণাল বিভার দিকে তাকিয়ে বলল- নতুন দিতি!

– হাঁ রে। ও হল বিভা দিদি।

মৃণাল হাসল– বিবা দিতি না, শুদু বিবা।

বিভা হাসতে হাসতে আনন্দ ঠাকুরের কাছ থেকে মৃণাল কে কোলে নিয়ে বলল- আচ্ছা বেশ। তুমি শুধু বিভা বলেই ডেকো আমায়।

মৃণাল হাততালি দিয়ে ওঠে - কী মজা কী মজা।

আনন্দ ঠাকুর মৃণাল কে জিজ্ঞাসা করেন - হাঁ রে দাদা, আমার যদু দাদা কোথায়?

মৃণাল দূরের স্কুলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল– পলাল ঘলে।

- ও। পড়ার ঘরে? বেশ বেশ, তুমি এখন এই দুটো দিদির কাছে থাকো আমি যদু দাদার সাথে একটু দেখা করে আসি।

আনন্দ ঠাকুর চলে গেলে মৃণাল হাত বাড়িয়ে বলে ওঠে - তলে গেল।

বিভা বলল – হ্যাঁ, চলে গেল। তুমি শুনলে না, উনি যদু দাদার সাথে দেখা করতে যাবেন ?

এতক্ষনে মৃণাল বিভার মুখের দিকে তাকায়। বিভা কপালে একটি ছোট্ট লাল টিপ পরেছিল, মৃণাল তার ক্ষুদ্র হাত দিয়ে সেটা তুলে নেয়।

অচলা বলল - এই মৃণাল, আমার সই-এর টিপ নিলি কেনরে?

– তিপ্ ! এইটা বলেই মৃণাল বিভার কপালে টিপটা পরিয়ে দেয়, তবে সেটা স্হানচ্যুত হয়েছে।

সেটা দেখে অচলা হো হো করে হেসে ফেলে - ও মৃণাল, তোর বিভাকে পছন্দ হয়েছে?

মৃণাল বলল- হয়েতে।

অচলা বলল– তোর গিন্নী বানাবি নাকিরে?

- তিন্নি বানাব।

অচলা বলল- তবে শোনো সই, আজ থেকে তুমি আমার সতীন হলে।

বিভা বলল- বেশ, তবে তাই।

অচলা মৃণালের ছোট্ট হাত ধরে বলল- দেখ মৃণাল, সুন্দরী বউ পেয়ে, এই কালো বউকে পায়ে ঠেলিস না যেন!

মৃণাল তখন বিভার হাতের চুড়ির গাছা নিয়ে নাড়ানাড়ি করছে। চুড়ির ঝনঝন আওয়াজে তার ভারী আনন্দ হচ্ছে। তবে লাল পলাটা বিশেষ করে তাকে আকৃষ্ট করেছে। সেটাকে আঙুল দিয়ে ধরে মৃণাল বলা- এইতে, দাও।

বিভা বলল- তুমি, ওটা নেবে?

- দাও, দাও, এইতে দাও।

বিভা হাতের সামনের দিকে একটা সাধারণ সোনার জল বাঁধানো চুড়ি বার করে দেয়। মৃণালের সেটা পছন্দ হয় না, সে ঘন ঘন করতে থাকে - না না এই তে নয়, ওই তে, ওই তে ।

- না বাবা, এটা খুলতে নেই।

মৃণাল রেগে গিয়ে তার হাতে থাকা চুড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। অচলা সেটা মাটি থেকে কুড়িয়ে এনে বিভাকে দেয়। বলল- ওকি, মৃণাল, ওভাবে ছুঁড়ে ফেলতে আছে?

- আতে।

অচলা বলল- জেদ করে না মৃণাল। ওই- চুড়িটা খুলতে নেই। ভগবান রাগ করবেন।

- লাগ, কলবেন?

- হাঁরে, রাগ করবেন ।

বিভা চুপ করে মৃণালের কথা শুনতে থাকে। অন্য সময় হলে এ কথার সে নিশ্চয় প্রতিবাদ করতো। তবে মৃণালের হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসা টুকরো টুকরো কথা গুলি তার প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিচ্ছে।

১২

বিকেল বেলায় অচলা আর বিভা পুকুর পাড়ে বসে বসে গল্প করছিল। মেঘ বেশ ঘোর করে এসছিল । তারপর দু চার ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তেই তারা দুজনে ছুটে ঘরে চলে চলে আসে। খানিকক্ষনের মধ্যেই প্রবল বৃষ্টিতে চারিদিক অদৃশ্য হয়ে যায়। অচলা, এসে বিভার ঘরে বসে। লাইট চলে গিয়েছিল, তাই-অচলা তার ঘর থেকে একটা হ্যারিকেন এনে জ্বালায়। দরজা, জানলা বন্ধ করে দুজনে গল্প করতে থাকে। কত হাসি ঠাট্টা রঙ্গ রসিকতার রোল ওঠে। দুজনের যেন কত দিনের পরিচয়। কত হাজার বছরের সই তারা। বিভা কোন স্কুলে পড়ায়, তার বাবার মারা যাওয়ার ঘটনা নিয়েও কথা হয়। এরমধ্যে অচলা বলল- আর তোমার মা কী করে মারা গেলেন? আর তোমার স্বামী, তিনি এখন কোথায়?

বিভা ব্যস্ত হয়ে বলল- সে অনেক কথা। আচ্ছা মৃণালের মা বাবা কোথায়? সে এখানে একা একা থাকে কেন?

- সে আর কী বলব সই? এক বছর আগে দোল যাত্রার দিনে ঠাকুর দেখেন মন্দিরের ধারে একটি গাছের তলায় একটি পাঁচ, ছয় মাসের শিশু শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। তার ধারে পাশে কেউ নেই। ঠাকুর তাকে কোলে তুলে নেন। তাকে অল্প দুধ খায়িয়ে শান্ত করেন। তারপর তার মা বাবা সম্বন্ধে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। অবশেষে একটি বুড়ো মানুষের সাথে দেখা হয়। তিনি বলেন, একজন প্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা মহিলা শিশুটিকে গাছের তলায় নামিয়ে দিয়ে চলে যায়।

তখন খোঁজ খুঁজি করা বন্ধ হয়। যদু দাদা তাকে এই আশ্রমে নিয়ে আসে। তাকে আশ্রমের সবাই খুব ভালোবাসে,যত্ন করে করে। যদুদাদা যতক্ষণ কাজে কর্মে থাকে ততক্ষণ সে এ,ওর কোলে ঘুরে বেড়ায়। বাকি সময় যদু দাদার কাছেই থাকে। রাতেও থাকে। যদু দাদা, মৃণালকে খুব ভালোবাসে। তার জন্যেই হয়তো জীবনে বাঁচার আশা আছে তার।

- কেন? এমন কেন বলছো?

- সে আর এক কাহিনী। আমি যতদূর ঠাকুরের মুখে শুনেছি, এই আশ্রমের ওই প্রাচীন বাড়িটাতে যদু দাদার বাবা, মা, দাদু, ঠাকুমা থাকতেন। যদু দাদার দাদু তখনকার দিনের অনেক বড় একজন ব্যারিস্টার ছিলেন। ফলে তার সম্পত্তি কিছু কম ছিল না। ওই বাড়িটা তিনিই বানিয়ে ছিলেন আর এই আশ্রমের সমস্ত জায়গাটাই তাঁর ছিল। তার ছেলে মানে যদু দাদার বাবা ডাক্তার ছিলেন, মস্ত বড়ো ডাক্তার। শোনা যায় নাকি নবদ্বীপের সবচেয়ে ভালো ডাক্তার ছিলেন। তিনি নিত্য মন্দিরে পুজো করতে যেতেন। ছোট বয়স থেকেই আনন্দঃ ঠাকুর সেই মন্দিরে পুজো করছেন। ফলে আনন্দ ঠাকুরের সাথে যদু দাদার বাবার বন্ধুত্ব হয়। তারপর যদু দাদার বাবার বিয়ে হয়। যদু দাদা হয়। যদু দাদা নাকি রোজ আনন্দ ঠাকুরের সাথে সকালে মন্দিরে যেত। ধীরে ধীরে যদু দাদাও বড়ো হতে থাকে। শুনেছি যদু দাদার পড়াশুনোর খুব ঝোঁক ছিল। বিজ্ঞান বিভাগে ওই পদার্থ বিদ্যা না কি যেন তাতে বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাই যদু দাদার বাবা ঠিক করে বিদেশে পাঠিয়ে তাকে পড়াশুনো করাবে। যদু দাদার মন চাইছিল না দেশ ছেড়ে যেতে কিন্তু তার বাবার প্রবল ইচ্ছার কথা ভেবে যেতে রাজি হয়। যদু দাদা বিদেশ যাবার দুদিন আগে তার বাবা জানতে পারে যে যদু দাদার মায়ের হৃৎপিণ্ডটা বাঁ দিকে নয়, ডান দিক। তাড়াতাড়ি করে সব পরীক্ষা করে জানা যায় তিনি বেশি বছর বাঁচবেন না। কিন্তু তার মা যদু দাদাকে কিছু জানাতে চাননি। তার বাবা-মার চোখে যদু দাদাকে নিয়ে কত স্বপ্ন। কিন্তু তারা জানত যদু দাদা যদি একথা জানতে পারে তাহলে আর কিছুতেই বিদেশে যাবে না। তাই যাবার আগে যদু দাদার মা যদু দাদাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যেন সে পড়া শেষ করেই দেশে ফিরে আসে। যদু দাদা বিদেশ চলে যায়। কিন্তু তিন বছরের মাথাতেই যদু দাদার মা প্রবল অসুখে পড়ে। একেই শারিরিক অসুস্থতা, তার উপরে আবার মানসিক টানাপোড়েন, তাকে বাঁচতেই হবে, ছেলের মুখ না দেখে সে কিছুতেই মরতে পারবে না। তার স্বামী সারাক্ষণ তার সেবা করত। তবুও অসুখকে কী আর এড়ানো যায় ? এমন করে সাত আট মাস কাটে। তার মা ঘুমের ঘোরে বলত "তিন বছর তো হয়ে গেল, আর কত দেরী করবি। আয় বাবা, ফিরে, আয়। আর কতদিন বাবা? আয় ফিরে আয়, ফিরে আয়।" যদু দাদা ফেরে না। যদু দাদার বাবা, আনন্দ ঠাকুর সকলে বলে যদু দাদাকে একটা খবর দেওয়ার জন্য, কিন্তু অসুখে পড়েও তার মায়ের কড়া হুকুম, ছেলে পড়াশুনো করছে , তাকে কোনোমতেই এ সংবাদ দেওয়া যাবে না। তাঁর বিশ্বাস তাঁর ছেলে তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখবে। একদিন সকাল বেলা প্রায় পাগলিনীর মতো যদু দাদার মা 'আমার যদু ফিরে এসেছে ,ফিরে এসেছে' বলে দৌঁড়ে যায়। মাঝে মাঝে আছাড় খেয়ে পড়ে, আবার দৌড়ে যায়। মন্দিরে মন্দিরে সেদিন স্মরণার্থীর ভিড়। যদু দাদার মা তাদের মধ্যে ঢুকে 'আমার যদু কোথায়? যদু কোথায়?' বলে খুঁজতে থাকে। ধাক্কা ধাক্কিতে কিছুজন স্মরণার্থীর পুজোর সামগ্রী পড়ে যায়। তাঁরা তখন

যদু দাদার মাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। বলে- 'ভিখারি কোথাকার। নিজে ভিক্ষা পাওনা বলে আমাদের জিনিস নষ্ট করতে এসেছো?' আনন্দ ঠাকুর গোলমাল দেখে ছুটে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে যদু দাদার বাবাও আসে। কিন্তু লাথির চোটে যদু দাদার মা সেখানেই শেষ হয়ে যায়। এত বড়ো একজন মানুষ শেষে কিনা ভিখারির অপবাদ পেয়ে মরল, এটা সহ্য করতে না পেরে যদু দাদার বাবা ভাগীরথী নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করে। যদু দাদা, তার বাবা মা মারা যাওয়ার নয় মাস পর ফিরে আসে। সেদিন তার কী আনন্দ, মায়ের জন্য নতুন নতুন শাড়ি, গয়না নিয়ে এসেছে সে, বাবার জন্যও নতুন জামা। কিন্তু ঘরে এসে দেখোর ঘরের তালা দেওয়া। সে তখন মন্দিরে আনন্দ ঠাকুরের কাছে যায়। ঠাকুর সমস্ত ঘটনাই তাকে জানায়। নিজের প্রতি অপমানে ঘৃণাতে তার প্রাণ ত্যাগ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঠাকুর তাকে আটকায়। তাকে বুঝিয়ে বল - 'তোমার মাকে ভিখারি ভেবে লাথি মেরে ফেলে না দিলে, তোমার মা হয়তো এখনও বেঁচে থাকতে পারতেন, আর তোমার বাবাও। প্রাণ ত্যাগ করে কখনও পুণ্য করা যায় না। আজ যদি দুনিয়াতে ভিখারি না থাকত, উচ্চ নীচ, জাতিতে ভেদাভেদ না থাকত, তবে দুনিয়াতে আজ অনেকেই বেচে থাকত। তোমার মা মারা গেছে। তুমি প্রাণ দিলেও আর তিনি ফিরবেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক মানুষকে এরকম মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারলে হয়তো অনেক সন্তানের বাবা মা বেঁচে থাকবে, অনেক বাবা মা তাদের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। শুধু এই কারণেই এই দুনিয়াতে ভিখারির সৃষ্টি হয়েছে- তারা হয় লোকের হাতে মরে, না হয় সমাজের হাতে, না হয় অনাহারে। এই রীতি বদলানোর মহান দায়িত্বই এখন তোমাকে নিতে হবে। একজন সন্তান হিসেবে এর থেকে বড়ো কর্তব্য আর কিছুতে নেই।' যদু দাদা তখন রাগে উঠে গিয়ে বলে- 'হয় এই দুনিয়া থেকে ভিখারি জাতি টাকে তুলে দেব না হয় এই গোটা দুনিয়াটাকেই ভিখারি বানিয়ে দেব।'

ঠাকুর তখন বলেন- 'শান্ত হও। রাগের মাথায় কিছু করতে যেও না। তুমি একাই তোমার এই ক্ষুদ্র জীবদ্দশায় এই কাজ করতে পারবে না।তোমার এই ভাবটাকে সকলের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কাজটা এত সহজ হবে না। তুমি বরং এই নবদ্বীপের সকল ভিখারীর সন্তানদের নিয়ে একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর। সেখানে প্রথমে তাদের শিক্ষা প্রদান কর। শিক্ষা ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব নয়, সবই অচল। প্রতিটি সন্তান যখনই শিক্ষার আলোতে আসবে তখনই দেখবে তাদের পারিপার্শ্বিক লোকেরাও কেমন শিক্ষিত হয়ে উঠছে। ছুঁতে পারলে শিক্ষার মতো ছোঁয়াচে রোগ নেই। তারা একদিন বড়ো হবে। তুমি তাদের এমন ভাবে শিক্ষা প্রদান করবে যাতে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে

তোমার ভাবটা জাগ্রত থাকে এবং পরবর্তী কালে তারা সেই ভাবটা যেন আরও শতজনের মধ্যে

প্রতিষ্ঠা করতে পারে।'

তারপরই যদু দাদা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে এবং তার মায়ের নামে এই আশ্রমের নাম রাখে সুলেখা ভবন'।

বিভা বলল– আর আশ্রম চালানোর জন্য এত টাকা আসে কোথা থেকে? এত বাচ্চার পড়াশুনা, খাবার দাবার, থাকা!

অচলা বলল- যদু দাদা নাকি বিদেশে পড়াশুনো করবার সময়, এক পরীক্ষায় পাশ করে প্রচুর টাকা পেয়েছিল। তাছাড়া সে বিজ্ঞান বিভাগের বই লেখে। দেশে বিদেশে তার বই নাকি পড়ানো হয়। সেখান থেকেও প্রচুর কর টাকা আসে।যদু দাদা এখানে থেকেই বিদেশে কাজ করে। তবে রাতে করতে হয় সেই কাজ আমি যতদূর জানি। তাছাড়াও যদু দাদার অনেক বড়ো বড়ো মানুষের সঙ্গে পরিচয় কিনা, তারাও বছরের বিভিন্ন সময় এসে অনেক অনেক টাকা দিয়ে যায়। টাকার অভাব কোনোদিন হয়নি এখানে। তাই আমরা ভিখারিরা আজ ভুলেই গেছি যে আমরা একদিন ভিখারি ছিলাম।

বিভা হেসে বলল- তবে, তোমাদের যদু দাদার তো এখন সুখের দিন গো?

- তা হলে তো হয়েই যেত। জান যদু দাদা নিজে সকলকে বলে যে দুঃখের গভীরতা যত বেশি হয়, আগত সুখের উজ্জ্বলতাও তত বেশি হয়, অথচ মা বাপ মরার পর থেকে এই মানুষটি যে নিজে কতটুকু সুখ দেখেছে, তাই সন্দেহ হয়।

- কেন?

এই দেখো সই। গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেল যে! আজ বৃষ্টি থামবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি বরং তোমার খাবারটা এনে দিই - এই বলে অচলা খাবার আনতে চলে যায়। বিভা খাটের উপর বসে উদাস ভাবে কী যেন ভাবতে থাকে। আজ সে যে পৃথিবীকে দেখছে, সেটা একেবারে অন্যরকম। একেবারে নতুন। আর তার ওই যদু দাদা মানুষটির কথা বার বার মনে পড়ছে। যে এই নতুন পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। এত মহৎ, এত পবিত্র মানুষও যে পৃথিবীতে থাকে এটা সে প্রথম দেখছে, প্রথম অনুভব করছে। তার যেন আরও দুটো নতুন চোখ গজিয়েছে, যে চোখে সে দেখছে - মানুষ নিজের জন্য বাঁচে না; অন্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাঁচে।

১৩

রাতের খাওয়া দাওয়া বিভা আর অচলা একসঙ্গেই করল। খাওয়া শেষ করে বিভা অচলাকে বলল- সই, তুমি তোমার এই সই-এর একটা কথা রাখবে?

অচলা বলল- বল না, সই।

-আজ রাতটা আমার কাছে শোবে?

অচলা হাসল- কেন গো সই, ভয় করছে নাকি?

- তা একটু করছে বটে, তাছাড়া তোমার কাছ থেকে গল্প শোনার লোভটা নেহাত ছাড়তে পারছিনা ।

- ওমা। সই, আমি পালিয়ে যাচ্ছি, না তুমি পালিয়ে যাচ্ছো যে আজ রাতেই সব গল্প শুনতে চাইছো ?

- তা জানি না। তবে আজ একা একা থাকলে আমার বড় মনখারাপ করবে !

- বেশ, আজ না হয় আমি তোমার কাছেই শোব। দাঁড়াও বাসনগুলো আগে রেখে দিয়ে আসি।

কিছুক্ষণ পর অচলা এঁটো খাবারের থালা রেখে বিভার ঘরে ফিরে এল। তার পর হ্যারিকেনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বলল- নাও দেখি সই, শুয়ে পড়, শুয়ে শুয়ে গল্প হবে।

- তাই ভালো। এসো আমার পাশে শুয়ে পড়।

অচলা গালে হাত দিয়ে বলল- তাই কী হয় সই? তুমি ওপরে শোয়ো আমি বরং- মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে যাচ্ছি।

বিভা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল- মাদুর পেতে শোবে কেন? তুমি আমার পাশেই শোবে। আর একান্তই যদি প্রয়োজন হয়, তবে আমিও তোমার সাথেই মেঝেতে শোবো। সই বলে ডাকতে পারো আর পাশে শুতে পারো না?

- রাগ করলে নাকি সই? ঠিক আছে আমি তোমার পাশেই শুচ্ছি।

অচলা গিয়ে বিভার পাশে শুয়ে পড়ে। তারপর বলা- বলো দেখি সই, এখন কোন গল্পটা শুনবে?

- যে গল্পটা বাকি রেখে চলে গিয়েছিলে।

অচলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তারপর বলে যদু দাদার এই আশ্রমে, ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভালোই কাটছিল। তারপর একদিন তার পিসি পিসেমশাই তার জন্য একটা সম্বন্ধ নিয়ে আসে। যেদিন তারা মেয়ে দেখতে যায়, সেদিন যদুদাদা যেতে পারেনি। সেদিন সারাদিন ধরে তার বিদেশে মিটিং চলছিল।

কথাগুলো শুনে বিভা চমকে উঠে বসে পড়ে । বিভাকে উঠে বসে পড়তে দেখে অচলাও উঠে পড়ে - কী হল সই?

বিভা মুখ শুকিয়ে গেছে - কিছু না। তারপর?

- তারপর মেয়েটিকে দেখে যদুদাদা ভালোবেসে ফেলে । তাদের বিয়ের ঠিক হয়। কিন্তু তার বিয়ে দিন আনন্দ ঠাকুর প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই খবর শোনা মাত্র যদু দাদা বিয়ে ছেড়ে হাসপাতালে চলে আসে। মা বাবাকে হারানোর পর আনন্দ ঠাকুরই তার কাছে সব ছিল। তাই সে সেদিন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল দেরী করলে যদি তার বাবা মায়ের মতো আনন্দ ঠাকুরকেও হারিয়ে ফেলে । হাসপাতালে ডাক্তার যখন খবর দেয় যে অত চিন্তার কিছু নেই, তখন যদু দাদা আবার বিয়ের জন্য ফিরে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু তখনই পাত্রীর মামা ফোন করে বলে অন্য কারোর সাথে পাত্রীর নাকি বিয়ে হয়ে গেছে।

কথাগুলো শুনে বিভার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অল্প আলোতে অচলা তা দেখতে পায় না।

কিছুক্ষণ বিভা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল - তোমার যদুদাদার নাম কী?

- যদু দাদা, আবার কী!

বিভা রেগে যায়- হেয়ালি করো না সই, তার ভালোোনামটা বল।

অচলা লজ্জা পায়- তার ভালো নাম আমি কেন, নবদ্বীপের অনেক মেয়েই মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জিত হবে।

- কেন?

- আমরা ঈশ্বর দেখিনি। তাকে দেখেছি। তাকে আমরা কৃষ্ণের মতো ভালোবাসি। সে আমাদের কাছে স্বামীতুল্য।

কথাটা শুনে বিভার খানিক রাগ হয়। তার ইচ্ছে করে বলতে যে, তাকে তারা যতই ভালোবাসুক না কেন সেই মানুষটি শুধু তার, একান্তই তার। কিন্তু সেসব কিছুই বলতে পারে না। শুধু এটুকুই বলল - আমাকে আজ তার নাম বলতেই হবে। নইলে এক্ষুনি আমি এই বৃষ্টিতো ভিজে ভিজে তার কাছে যাব।

বিভাকে খাট থেকে নামায় উদ্যত হতে দেখে অচলা তার হাত টেনে ধরে বলল- ও কী কর সই? পাগল হলে নাকি? জানিনা, তার নাম জানতে কেন তোমার এমন প্রবল ইচ্ছা। তাও বলছি তার নাম সুপর্ণ সেনগুপ্ত। যেটুকু সন্দেহ ছিল এবার সেটাও চলে যায় বিভার মন থেকে। ইনিই তার স্বামী। বিভা খানিক্ষণ চুপ করে খাটের উপর বসে থাকে।

তাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে কে অচলা বলল- বসে রইলে যে সই? শুয়ে পড়। বিভা আর কোনো কথা না বলে শুয়ে পড়ল। কিন্তু বিভার চোখে ঘুম আসে না। অনেক দিনের পুরোনো একটা চাপা কান্না যেন শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু পারছে না।

১৪

সকালে উঠে বিভা দেখে বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘ আর নেই, চারিদিকে ঝলমলে রোদ উঠেছে। অচলা কখন উঠে যে চলে গিয়েছে, সেটা সে জানতেই পারেনি। বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে বিভা জানালার পাশে দাঁড়ায়। সুপর্ণর কথাটা মনে পড়তেই সে তার বুকের কাছে একটা ব্যথা অনুভব করে। সে জানলা দিয়ে সুপর্ণর ঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষনের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে। তারপরই তার মনে পড়ে যায় সেইদিনের কথাটা, যেদিন সে সুপর্ণকে ফোন করেছিল। সুপর্ণকে ফোন ধরে কোনো উত্তর দেয়নি। হয়তো সে রাগ করছে- এটাই বিভা ভেবেছিল, তারপর সে তার সমস্ত কথা জানায়। কিন্তু সমস্ত কথা শোনার পরেও সুপর্ণ তেমনি চুপ করেই ছিল। তারপর হঠাৎ করে ফোনটা কেটে দেয়। কথাটা মনে পড়লে তার দুঃখের খানিকটা অংশ অভিমানে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে সবকিছু শোনার পরও কেন তাকে নিতে এল না। সম্পূর্ণ অসহায়, একাকী মেয়ে জেনেও, সে কেন তাকে স্বীকার করল না? এই তার আদর্শবাদ? এই তিনি নাকি সৎ মানুষ? এই তিনি নাকি সবার ভাল চান?

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে বিভা একে দেখে নীচে রাস্তায় অচলা গান গাইতে গাইতে হেলতে দুলতে আসছে -

নীল আকাশে রোদ উঠেছে,
আমার শুকতারাটি হারিয়ে গেছে,
সাহেব বিবির মদের গেলাস, ফাঁকা পড়ে রে -
নীল যমুনায় ডুব দিয়েছি,
তোর বাগানের ফুল তুলেছি;
তাই বলে কী রাগ করেছিস রে-
রোজ সকালে কোনো বাতাস ঢেউ-এ
তোর শরীর সুবাস উথলে পড়ে
তবুও তোর ধরা যে আর পাই নারে-

- কিগো সই, উঠে পড়েছো?

বিভা বলল- তুমি সত্যিই খুব ভালো গান গাও। এমন গান পাও কোথায়?

- সে আমিও জনিনা। একটা লাইন গান ধরলেই পরের লাইন গুলি আপনি আপনি চলে আসে।

- আচ্ছা। জানো, আমার মাও না খুব ভালো গান গায়ত।

- তাই নাকি?

- হ্যাঁ।

অচলা বলল - তুমি কিন্তু কাল আমার থেকে অনেক গল্প শুনে নিয়েছো, আজ কিন্তু আমি তোমার থেকে গল্প শুনবো।

বিভা হেসে বলল- বেশ, তা হবে, কিন্তু সকাল সকাল আমার গল্প বলতে ইচ্ছে করছেনা।

- তা কি আমি বলেছি নাকি? নাও দেখি সই। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আজ তোমাকে স্কুলে নিয়ে যাব।

বিভা তৈরি হয়ে নেয় । তারপর তারা স্কুলে গিয়ে পৌঁছায়। অনেক ছেলেমেয়ে তখন স্কুলের মাঠে খেলা করছিল। বিভা এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে শুধু একটি মানুষকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে হল সুপর্ণ। তাকে যে কেন কে খুঁজে বেড়াচ্ছে তা সে নিজেও জানে না। দেখতে পেলে কী বলবে? রাগ দেখিয়ে চলে যাবে? না তার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদবে, বিয়ের দিন ঠিক যেমন ভাবে কেঁদেছিল?

অচলা বলল– ও সই, তুমি এখানে ছেলে মেয়ে গুলোর কাছে একটু থাকবে? আমার ওদিকে একটু কাজ আছে। আমি কাজ সেরে আসছি?

বিভা বলল- হ্যাঁ, যাও। আমি তোমার জন্য এখানেই অপেক্ষা করব।

- ঠিক আছে।

অচলা চলে যায়, তার পর বিভা ওই ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে গুলোর কাছে গিয়ে তাদের নাম জিজ্ঞাস করে। তাদের মা বাবা কারা এইসব জিজ্ঞাসা করে, অনেক হাসির গল্প করে, তাদের সাথে খেলাতে যোগ দেয়। কখনও ছোটাছুটি করে তাদের সাথে, কখনও হাত ধরাধরি করে গোল গোল করে ঘুরতে থাকে। এদের সাথে খেলতে খেলতে বিভা তার বয়সটাই বোধ হয় ভুলে যায়। সে যখন লুকোচুরি খেলাতে যোগদান করেছে তখন একটি বাচ্চা মেয়ের সাথে একটি ঘরের দিকে দৌড়ে যায় লুকোবার জন্য। ঘরে ঢুকতেই বিভা চমকে দাঁড়ায়। ঘরটি ছিল লাইব্রেরি রুম। অসংখ্য

বই-এর সমাহার সেখানে। তাঁর মধ্যে একটা লোক একটা টেবিলের সামনে একটি চেয়ারে বসে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বই পড়ছে। বিভার চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়না, ইনিই- তার সুপর্ণ, সুপর্ণ সেনগুপ্ত। তাদের চিৎকার শুনেই সুপর্ণ বই থেকে মুখ না তুলেই বলল- এখানে না, অন্যখানে খেলা করো।

ওই বাচ্চা মেয়েটি বলে ওঠল- যদু দাদা রাগ করবেন। চল। চল বিভা দিদি এখান থেকে চল।

ওই বাচ্চা মেয়েটির মুখে 'বিভা দিদি' নামটা শুনে সুপর্ণ বই থেকে মুখ তোলে। সে দেখে সত্যিই তার সামনে বিভা দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সুপর্ণ বলল- 'আপনি এখানে?'

বিভা বলল- আমাকে এখানে আনন্দ ঠাকুর নিয়ে এসেছেন।

সুপর্ণ অবাক হয়- দাদা ঠাকুর! কেন?

- আমি একদিনের জন্য নবদ্বীপ ঘুরতে এসেছিলাম। কিন্তু গোটা দেশে লকডাউন জারি হওয়ায় আর বাড়ি ফিরতে পারিনি। তাই তিনি আমায় এখানে নিয়ে এসেছেন। আমি এখানে সারাজীবনের জন্য থাকতে আসিনি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই চলে যাব। কিন্তু আপনার যদি অসুবিধা থাকে বলতে পারেন। আমি এক্ষুনি চলে যাব।

- অসুবিধে থাকতে যাবে কেন? তাছাড়া দাদাঠাকুর যখন নিজে আপনাকে নিয়ে এসেছে তখন আপনি থাকবে না, থাকবেননা, তা আমি বলার কে?

সুপর্ণর কথা শেষ হতে না হতেই কোথা থেকে মৃণাল ছুটে এসে বিভার পা জড়িয়ে ধরে বলল - বিবা।

বিভা মৃণাল কে কোলে তুলে নিয়ে বলল- মৃণাল, তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষন? তোমায় তো দেখতেই পাইনি।

মৃণাল বলল– আমি তো তন্দ দাদার কাচে চিলাম।
- তুমি চন্দ্র দাদার কাছে ছিলে?

মৃণাল কোনো উত্তর না দিয়ে আগের দিনের মতোই বিভার টিপটি কপাল থেকে তুলে নিয়ে সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

সুপর্ণ মৃণাল কে জিজ্ঞাসা করল- মৃণাল, খাবার খাওয়া হয়েছে?

মৃণাল উত্তর দেয় - হুঁ। তারপর অতি আনন্দের সাথে বলে ওঠে - দতুদাদা এইটা আমার তিন্নি।

সুপর্ণ হা হা করে হেসে উঠল- গিন্নি!

- হুঁ, তিন্নি!

মৃণালও হিহি করে হাসতে থাকে। তার সামনের দিকে দুটো ছোট ছোট দাঁত বেরিয়েছে। সুপর্ণ মৃণালের গাল হালকা করে টিপে বলল- পাকা একটা! মৃদু হাসে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। বিভা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘর থোক বাইরে চলে আসে।আর যে মেয়েটি বিভার সাথে খেলছিল সে ফিরে যায় তার খেলাতে। বিভার প্রচন্ড রাগ হয় সুপর্ণর উপর। সে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা গাছকে ঘিরে বাঁধানো বেদির উপর বসে, মৃণালকে তার পাশে বসায়।মৃণাল তখনও বিভার টিপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। কিছুক্ষন পর অচলা এসে তাদের পাশে বসে। বিভাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বলল- কী গো সই, অমন চুপচাপ বসে আছো যে?

বিভা কোনো উত্তর দেয় না। মৃণাল বিভার হাতটা নিজের মধ্যে টেনে তার চুড়ি গুলো টানাটানি করতে থাকে। টানাটানি করতে গিয়ে চুড়ির গোছাতে তার কপালে আঘাত লাগে, অমনি সে কেঁদে ওঠে। তাকে কেঁদে উঠতে দেখেই বিভা মৃণালের কপালে হাত বুলিয়ে দেয়- উ..কী হল মৃণাল? কোথায় লাগল?

অচলাকে বলল - সই, একটু জল নিয়ে এসো তো।

অচলা একটু জল এনে মৃণালের কপালে দেয়, কিন্তু এখনও মৃণাল কেঁদেই চলেছে। আর বলছে- এই তে আমার চাই অ্যা-এ…

অচলা বলল - আবার তোমার পলা নিয়ে পড়েছেগো সই।

বিভা তৎক্ষনাৎ সেটি হাত থেকে খুলে মৃণালের হাতে দেয়।

- ও কী করলে গো সই? পলা খুললে কেন?

- তাতে দোষ কী আছে? ওটা নিয়ে মৃণাল যদি শান্ত থাকে তবে থাক।

অচলা কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়। সে মৃণালকে বলল - সাবধানে বাবা, হারাস না যেন।

মৃণাল কান্না থামিয়ে বলল - না! হালাব না! লাগ কলবেন!

১৫

এমনি করে প্রায় একসপ্তাহ পার হয়। বিভা হাসিতে, খুশিতে, বেশ আরামেই থাকে। প্রতিদিন সকালে সে স্কুলে যায়, ছেলেমেয়েদের সাথে খেলা করে এমনকি বিকেল বেলাতেও মাঝে মধ্যে তাদের কাছে যায়। তাদের কিছু কিছু জিনিস পড়ায়, গল্প শোনায়। এখন মৃণাল বেশির ভাগ সময়টাই বিভার কাছে থাকে। ওই দুপুর বেলায় একবার আর সন্ধ্যের পর সুপর্ণর কাছে যায়। আজ বিকেলে বিভা আর অচলা পুকুর পাড়ে বসে বসে গল্প করছে এমন সময় "মৃণাল কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বিভার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার গলা জড়িয়ে ধরে। বিভা তাকে সামনে টেনে এনে বলল- কী হয়েছে মৃণাল? কাঁদছো কেন? কার সাথে এখানে এলে তুমি?

মৃণাল কিছু না বলে কাঁদতেই থাকে।

অচলা বলল - আমার সতীনের জন্য মন খারাপ করছিল বুঝি?

মৃণাল তখন তার কান্না একটু কমিয়ে বলে আমাকে দিল না, অ্যাঁ....

বিভা বলল- কী দিল না তোমাকে ? কে দিল না ?

মৃণাল কাঁদতে কাঁদতে বলল- আমি মা কাব। অ্যাঁ....আমাকে... অ্যাঁঅ্যাঁ... দিল না।

বিভা বলল- তুমি মা যাবে?

- অ্যাঁ....না, আমি মা কাব।

অচলা বলল- দাঁড়াও গো সই, ও বোধ হয় বলছে ও মা খাবে !

- সে কী বলছো সই?!

অচলা বলল– একবার ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখো দেখি ।

মৃণাল নিজে থেকেই বলল- অতলা থিক্ বলছে, আমি মা কাব। অ্যাঁ....

বিভা আবার জিজ্ঞাসা করল - তুমি মা খাবে?!

- হুঁঃ।

কথাটা শুনে বিভা ও অচলা দুজনেই হেসে ফেলে। তারপর বিভা বলল- মা কী খাবার জিনিস, নাকি, মৃণাল?

মৃণাল এবার একটু চুপ দেয় - তবে যে তুক দিদি বলল।

অচলা বলল – টুক দিদি কী বলল?

- বলল, তাল কাচে মা আচে। আমি বললাম আমাকে মা দিতে, তো বলল আমাকে দেবে না। সেতা শুধু তাল মা।

বিভা অচলা কে জিজ্ঞাসা করল- টুকু দিদিটা কে?

অচলা বলল- আরে, ও টুকটুকির কথা বলছে। ও তো স্কুলের এক ছাত্রী।

- আমি মা কাব।

বিভার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে ওঠে। সে কি করে এখন মৃণালকে বোঝাবে মা কী - না মৃণাল, মা খাওয়ার জিনিস নয়।

মৃণালের চোখে এবার কৌতুহল - তবে, কেলার দিনিস?

বিভা বলল- না, খেলার জিনিসও না। তুমি যেমন আমাকে বিভা বলে ডাকো, আমি যেমন তোমাকে মৃণাল বলে ডাকি। সেরকম যে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালো বাসে, সে তোমার মা হয়। বুঝলে ?

মৃণাল চুপ করে বিভার কথাগুলো শোনে, তারপর বলে তবে তুমি আমাল মা আল দতুদাদা আমাল মা।

বিভা আর অচলা হাসে।

- না বাবা, আমি তোমার মা নই। আমি তো তোমার বিভা!

মৃণাল তার দিই হাত দিয়ে বিভার গলা জড়িয়ে ধরে - না বিবা, না; তুমি আমাল মা। বল তুমি আমাল মা?

বিভা কিচ্ছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল- বেশ আমি তোমার, মা।

মৃণাল বিভার কথা শুনে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে - কী মজা কী মজা, আমাল ও মা আচে। আমিও তুক্ দিদিকে আমাল মা দোবো না।

এবার বিভা মৃণালকে তার কোলের আরও কাছে টেনে দুই হাত দিয়ে তাকে জাপটে ধরে বলল বেশ দিও না।

আর এই ঘটনাটা দেখে অচলার চোখে জল্ চলে আসে। তাকে দেখে বিভা বলল - ও কি সই কাঁদ কেন? তুমি বরং এখন একটা গান ধর, অচলা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে গান ধরে

ওরে ও জননী দেখ,
মৃণাল জলে ডুব দিয়েছে,
পদ্মপাতায় ঠাঁই পেয়েছে,
হীরার মতো দুলছে দ্যুতি দেখ-
ওরে ও জননী দেখ,
তোর নাড়ীকে ভুলে গেছে,
অন্য মনে ঠাঁই পেয়েছে,
তাকে তার মা মেনেছে,
বিশ্বজননী, মা হারাকে মা দিয়েছে দেখ-
ওরে ও জননী দেখ,
কত অচলা গান ধরেছে
নতুন স্মৃতি মনে বেঁধেছে
দুঃখ গিয়ে সুখে মিশেছে।
আনন্দ আজ ধরে না যে দেখ
ওরে ও জননী দেখ।

১৬

এমনি করে আরও কিছুদিন কেটে যায়। আজ সকাল থেকেই মৃণাল বিভার কাছে ছিল। বিভা তাকে খাবারও খাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু সকাল থেকেই তার মাথা ধরেছে।এমনিতেই তার মাইগ্রেন আছে, তার উপর আবার আজকে চড়া রোদ। অচলা তার কাজে গেছে, বিভা মৃণাল কে নিয়ে তার ঘরেই ছিল। কিন্তু তার মাথা ব্যথা ক্রমশ বাড়ছে দেখে সে ঠিক করে মৃণালকে সুপর্ণর কাছে দিয়ে আসবে। কারণ মাথা ব্যথা প্রচন্ড হলে সে আর বসে থাকতে পারে না, তাই মৃণাল এদিক ওদিক চলে যেতে পারে এই ভেবেই মৃণালকে সুপর্ণর কাছে দিয়ে আসার জন্য বেরিয়ে পড়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে রোদ মাথায় পড়তেই যেন তার মাথা ব্যথা দ্বিগুন হয়ে যায়। পা টলতে থাকে। চোখ বন্ধ হয়ে আসে, কিন্তু কোনো মতে অতি কষ্টে সুপর্ণর বাড়ি পৌঁছায়। তারপর মৃণালকে জিজ্ঞাসা করে- হ্যাঁরে, তোর যদুদাদা কোথায়?

মৃণাল একটা রুমের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল- ঐ যে ওইকানে দতু দাদা তাকে।

বিভা মৃণালকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল- তবে তুই চলে যা।

এমনিতেই বিভার মাথা ধরেছিল, তার উপরে সুপর্ণর উপর তার প্রচণ্ড রাগ তাই সে বাড়ির ভেতর যেতে চাইল না। কিন্তু মৃণাল তাকে কিছুতেই ছাড়েনা। বলল- তুমি চল না মা ।চল না ।

তাই বাধ্য হয়েই বিভা ঘরে ঢোকে। মৃণালের দেখানো রুমটিতে ঢুকেই দেখে সুপর্ণ খাটের উপরে বালিশে হেলান দিয়ে বই পড়ছে। বিভা আর মৃণালকে দেখে সে সোজা হয়ে উঠে বসে। বিভা কোনো কথা না বলে মৃণালকে কে তাঁর পাশে খাটের উপর বসিয়ে চেল আসে। কিন্তু যখনই সে দরজার কাছে আসে তখনই মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে এবং বসে পড়ে, তাকে এভাবে বসে পড়তে দেখে সুপর্ণ তার কাছে ছুটে আসে- আপনার কী শরীর খারাপ করছে?

বিভা কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল- না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দু পা যেতেই উলটে পড়ে মেঝের উপর।

সুপর্ণ ভয়ার্ত স্বরে বলল- বিভা ! তারপর তার কাছে গিয়ে দেখে, বিভা একেবারে ঘেমে গিয়েছে। প্রায় অজ্ঞান হবার মতো অবস্থা। সে ফ্যানের সুইচটা অন করে দিয়ে একটা বোতলে করে জল নিয়ে আসে। তারপর বিভার মাথাটা তার কোলের উপর রেখে তার মুখে চোখে জল দেয়।

- আপনি ঠিক আছেন?

- হ্যাঁ। বিভো মৃদু স্বরে উত্তর দেয়। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলে আপনি অচলাকে আমার সাইড ব্যাগটা একটু নিয়ে আসতে বলুন। সেখানে আমার ওষুধ আছে।

- কীসের ওষুধ খাবেন আপনি?

- মাই.. মাইগ্রেনের।

মৃণাল তখন মা মা বলে ছুটে এসেছে। সুপর্ণন তাকে বলল- তুমি তোমার মায়ের কাছে একটু বসোতো, আমি একটু আসছি। সুপর্ণ চলে যায়। মৃণাল, বিভার কাছে এসে বসে। মা মা বলে কেঁদে ওঠে।

কিছুক্ষন পরই সুপর্ণ আর অচলা ফিরে আসে।

অচলা, বিভাকে কে তোর সাইড ব্যাগটা দিয়ে বলল- কী হলো গো সই?

বিভা সেই অবস্থাতেই ব্যাগটা খুলে একটা প্লাস্টিকের বাক্স বের করে। সেখানে নানা রকমের ওষুধ ছিল। বিভা সেখান থেকে একটা ওষুধ খুলে নিয়ে খেতে যায়। কিন্তু খাবার আগেই সুপর্ণ তার হাতটা ধরে নিয়ে বলল- কী করছেন কী আপনি? কীসের ওষুধ খাচ্ছেন ওটা?

বিভা জড়ানো জড়ানো ভাষায় বলল- মাথাব্যথার ওষুধ।

সুপর্ণ বিভোর হাত থেকে ওষুধটা নিয়ে বলল- এটা ব্লাড প্রেসারের ওষুধ। তারপর সে ওষুধের বাক্সটা থেকে অন্য একটা ওষুধ বের করে বিভাকে খাইয়ে দেয়।

- যা তো অচলা, বিভাকে নিয়ে গিয়ে খাটে শুইয়ে দে।

অচলা আস্তে আস্তে বিভাকে দাঁড় করায়। তারপর তাকে ধরে ধরে নিয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দেয়। অচলা দেখে সুপর্ণ চোখ দুটো জলে ছলছল করে উঠেছে, মৃণাল পেছনে পেছনে এসে তার মায়ের পাশে খাটের উপরে বসেছে।

বিভা ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিকেল নাগাদ তার ঘুম ঘুম ভাঙে। উঠে দেখে সুপর্ণ সেই ঘরেই একটা চেয়ারের উপর বসে বসে বই পড়ছে আর মৃণাল তার পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মাথাব্যথাটা এখন একদমই নেই । বিভাকে উঠতে দেখে সুপর্ণ জিজ্ঞাসা করল- ঘুম হল, বিভা?

সুপর্ণর মুখে তার নামটা শুনে তার শরীর জুড়ে, কীরকম একটা শিহরণ বয়ে যায়। সে একটু লজ্জিত হয়, আবার একটু অভিমানীও হয়। এই দুইএর মিশ্রিত অনুভূতিতে সে জবার দিল- হ্যাঁ। কিছুক্ষণ তারা দুজনেই চুপ থাকে, তারপর সুপর্ণ আবার প্রশ্ন করে- মাথা ব্যথা আর নেই , তাই তো?

এবার বিভা একটু বেশিই রেগে যায় । সে দ্বিতীয়বার হ্যাঁ উত্তরটি দিয়ে খাট থেকে উঠে পড়ে।

তার সাইড ব্যাগটা পাশেই ছিল, সেটাকে তুলে নিয়ে সে বলল- আমি এখন আসছি।

কথাটা বলেই বিভা চলে যায়। সুপর্ণকে আর কিছু বলবার সুযোগ মাত্র দেয় না। বিভো চলে গেলে সুপর্ণ এক দৃষ্টিতে বিছানাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেখানে বিভা এতক্ষণ শুয়ে ছিল, আর তার পাশেই মৃণাল হাত পা ছড়িয়ে এক পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

বিভা তার ঘরে এসে বসে পড়ে। তখন অচলাও ছিল না সেখানে। সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে যায়। একাকী ঘরে চোখের জল লুকোবার কোনো ব্যস্ততা ছিল না তার। সে জোরে জোরে কাঁদতে থাকে। কতদিনের যে কষ্ট জমে ছিল তার মধ্যে। তার সেই দৃশ্যটাই বার বার মনে পড়তে থাকে যখন সুপর্ণ তার মাথাটা তুলে, তার কোলের উপর রখে। যেন কত দিনের পরিচয়! কত আদরের মানুষ বিভা, তার কাছে! এমন স্বামী কজন মানুষ পায়?

কিছুক্ষণ ধরে এইসব কথা ভাবার পর তার মনটা একটু হালকা হয়। তারপর সে ব্যাগ থেকে তার ওষুধের বাক্সটা বের করে। বাক্সটা খুলাতেই দেখে লাল, নীল, হলুদ, সাদা, সবুজ বিভিন্ন রঙিন কাগজে ওষুধের প্যাকেট গুলি মোড়া আছে। কাগজের ওপর কোনটা কী ওষুধ, কতবার খেতে হয়, কখন কখন খেতে হয়, তা সুন্দর অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার মধ্যে একটা সাদা কাগজ এমনি পড়ে আছে। বিভা সেটা খুলে দেখে সেখানেও কিছু লেখা রয়েছে। সেখানে লেখা রয়েছে - আপনি যখন মাথা ব্যথায় অসহ্য কষ্ট পাচ্ছিলেন তখন আপনি উল্টো ওষুধ খেতে গিয়েছিলেন ।একবার ভেবে দেখেছেন, কী হত এটা হলে? তাই আমি ওষুধ গুলো আলাদা আলাদা রঙের কাগজে মুড়ে নাম লিখে দিয়েছি। আশা করি ভবিষ্যতে উল্টোপাল্টা ওষুধ আর আপনি খাবেন না। নিজের শরীরের যত্ন নেবেন।

চিঠিটা পড়ে বিভা যেন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু যে স্বামী তার নিজের স্ত্রীকে স্বীকার করে না, তার স্ত্রীর অসুস্থতায় সামান্য ওষুধ খাওয়ার জন্য এচিঠির অর্থ

কী? এই কথাটা ভেবেই বিভা মানসিক ভাবে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে যায় কিন্তু ছিঁড়ে ফেলতে পারে না।

১৭

পরদিন সকালে বিভা স্কুলের দিকে যায়। তার হাতে সেই সুপর্ণর চিঠিটা। সারারাত তার ঘুম হয়নি। চোখ দুটো তার লাল হয়ে আছে। সে একপ্রকার ছুটতে ছুটতে যায় স্কুলের দিক। গিয়ে দেখে চন্দ্রনাথ বাচ্চাদের ক্লাস করাচ্ছে। বিভা চন্দ্রনাথকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে 'সুপর্ণ কোথায়' ।চন্দ্রনাথ বলে সুপর্ণ লাইব্রেরি রুমে আছে। শুনে বিভা লাইব্রেরি রুমে যায়। গিয়ে দেখে সুপর্ণ মৃণাল কে সামনে বসিয়ে রেখে গল্প শোনাচ্ছে। সে যেতেই সুপর্ণ তার দিকে তাকায়। তারপর তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল - আপনি ভালো আছেন তো এখন?

কথাটা শুনে বিভা সুপর্ণর চিঠিটা তার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে বলল – এসব কী? আমি মরি কী বাঁচি তাতে আপনার কী?

সুপর্ণ বলল – আমি কী কিছু ভুল করেছি?

- হ্যাঁ, করেছেন। একশোবার ভুল করেছেন। কোন অধিকারে আপনি এসব করেছেন?

- তা, ঠিক। আমার আপনার উপর কোনো অধিকারই নেই। আপনি তো অন্য কারোর স্ত্রী।

বিভা খানিক আশ্চর্য হয়। তারপর ভাবে তার মামা তাকে কথা শুনিয়েছিল বলে এখনও সে রাগ করে আছে। তাই এই কথা বলেছে। তখন বিভাও বলল - তা আপনিও কী নিজেকে অন্য কারোর স্বামী বলে মনে করেন?

সুপর্ণ একটু হাসল – স্বামী শব্দটা এজীবনে আমার জন্য কখনই প্রযোজ্য হবে না।

- মানে?

- ক্ষমা করবেন, তবুও আজ আপনাকে একটা সত্যি কথা বলি । আমি আজও আপনাকে ভালোবাসি। আপনাকে বিয়ে করতে যাওযার সমায় যখন জানতে পারি আপনার বিয়ে হয়ে গেছে, তখন নিজেকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করেছিল। তারপর দিন দিন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ি, কাজে মন দিতে পারতাম না ।

দাদাঠাকুর সুস্থ হয়ে এসে যখন আমার এই অবস্থা দেখে তখন তিনি আমাকে আবার বিয়ে করার কথা বলেন। কিন্তু আমি তা করতে পারি না। আমি আমার মন প্রাণ সব আপনাকে দিয়েছি। তাই অন্য কাউকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যখন দেখলাম আপনি অন্য কারোর স্ত্রী এবং আমিও আর অন্য কারোকে বিয়ে করতে পারব না, তখন আমি রাধামাধবের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করি যে, আমি কখনও বিয়ে করব না।

বিভার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। সে এখনও বুঝে উঠতে পারছেনা যে সুপর্ণ এগুলো কি বলছে - আমার সাথে একবারও কথা না বলে, আপনি কি করে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে বিয়ে করবেন না ?

- মানে ? কী বলছেন, আমি কেন আপনার সাথে কথা বলতে যাব? আপনি তো অন্য কারোকে বিয়ে করেছেন ?

বিভার মাথায় আবার রাগ চেপে যায় - কেন, আমি আপনাকে ফোনে সব কথা জানাইনি? নাকি আপনি এই বিয়ে টাকে বিয়ে বলেই মানেন না?

সুপর্ণ অবাক হয়ে বলল - ফোনে আপনি কী জানিয়েছেন? বিয়ের দিনের পর থেকে এখানে আসার আগে পর্যন্ত আপনার সাথে তো আমার কোনো কথাই হয়নি!

- কথা হয়নি মানে? আমি তো মায়ের মারা যাওয়ার এগারো দিন পরেই আপনাকে ফোন করেছিলাম।

সুপর্ণ চমকে ওঠে- আপনার মা মারা গেছেন? কবে? আর আমাকে ফোন করলে তো আপনি পাবেন ও না তখন। কারণ তখন আমার ফোনটা চন্দ্র নিয়েছিল, তার বিশেষ কাজের জন্য।

বিভার সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সে খানিক শান্ত হয়ে বলল- তার মানে কি? আপনি কিছুই জানেন না?

সুপর্ণ বলল - না। কী হয়েছে বলুন তো ?

এবার বিভা সেদিন রাতের সমস্ত ঘটনা সুপর্ণকে জানায়। কথাগুলো শুনে সুপর্ণ সামনের একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ে। সেই সময় চন্দ্রনাথ এসে হাজির হয়।

সুপর্ণ, ক্লাস ফাইভের ভূগোল বই এখানে বাড়তি আছে কী?চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করে।

সুপর্ণ কথার কোনো উত্তর দেয় না। চন্দ্রনাথ দেখে বিভা এবং সুপর্ণ দুজনেই হতভম্বের মতো হয়ে গেছে। সুপর্ণ যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। সে সুপর্ণকে জিজ্ঞাসা করল - কী হয়েছে, সুপর্ণ? কথা বলছিস না যে?

সুপর্ণ একটা ঢোক গিলে বলল- আমার সাথে যে মেয়েটার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সে আমার ফোনে ফোন করেছিল? সুপর্ণর প্রশ্নটা চন্দ্রনাথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত করে। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

সুপর্ণ এবার চিৎকার করে বলে ওঠল- চুপ করে থাকিস না চন্দ্র, কথার উত্তর দে।

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়ে বলল- হ্যাঁ।

- তবে আমায় বলিসনি কেন? সে যে আমার স্ত্রী, সে একথা বলেছিল? সত্যি করে বল।

চন্দ্রনাথ বলল- হ্যাঁ। সে বলেছিল, তোর অজান্তেই তার সাথে নাকি তোর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু কী করে বলতাম বল? তুই যে ঠাকুরের পা ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করলি। আমি তোকে কী করে তোর প্রতিজ্ঞা ভাঙতে দিই? কিন্তু তুই জানলি কী করে এসব কথা?

সুপর্ণ বিভার দিকে তাকিয়ে বলল- তোর সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, সেই আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

কিছুক্ষণ তিনজনেই নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটায়। তারপর বিভাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল- এখন আর করার কিছু নেই। আমি আপনার স্ত্রী হয়েও আপনার স্ত্রীর অধিকার কোনোদিন পাব না আর আমি চাই ও না যে শুধুমাত্র আমাকে স্ত্রীর অধিকার দেওয়ার জন্য আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা ভাঙুন। বিয়েটা আপনার অজান্তেই হয়েছিল, তাই আজকে এসব জানার আগে পর্যন্ত আপনি অবিবাহিত ছিলেন।

আপনি যদি বিয়েটাকে অস্বীকার করেন, তবে আপনি এখনও অবিবাহিত আর ভবিষ্যতেও তাই থাকবেন। আর আমিও এটাই চাই। তাতে আপনার করা প্রতিজ্ঞা আগের মতোই অটুট থাকবে।

সুপর্ণ বুজে আসা গলায় বলল– আর, আপনার কী হবে?

– আপনি নাই মানতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে আমার স্বামী মেনেছি। আর এইটা মেনেই হতভাগিনীর মতো বাকি জীবনটা একাএকা কাটিয়ে দেব।

১৮

দিন ক্রমশ পার হতে থাকে। এদিকে মহামারিও বিশ্বে বিভীষিকা আকার ধারণ করেছে। ভারতেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। আজ বিকেল থেকেই আকাশে যেন কালো মেঘের চাদর বিছানো রয়েছে। নিজের ঘরে বসে বিভা, অচলা গল্প করছিল। তবে সেই গল্পে কোনো রসিকতা ছিল না, সুখ-দুঃখের কথা ছিল না। শুধু একজনের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে অপর জনের অনুতাপ ছিল, সহানুভূতি ছিল। মৃণালও তাদের সঙ্গে ঘরে ছিল, সে মেঝেতে বসে খেলছিল। মেঝেতে অল্প জল পড়েছিল, সেই অল্প জলেই সে পা ছুড়ছিল, ছোট ছোট দুটি হাত করে তার উপর ছপাক ছপাক আওয়াজ করছিল। কখনও কখনও ঘরের মধ্যেই এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল। খেলছিল, দুলছিল, হাসছিল, তালি দিচ্ছিল। অচলার চুল ধরে টানাটানি করছিল। আধো আধো অস্পষ্ট বুলিতে ঘরময় মাতামাতি করছিল।

মেঘ ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছিল, যেন পৃথিবীর সমস্ত মেঘ একস্থানে এসে জড়ো হয়েছে। ঘরের প্রতিটি কোণের অন্ধকারও ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে। কারেন্ট ছিল না, ফলে অচলা তার হ্যারিকেনটা এনে জ্বালিয়ে দেয়। বিভাও মৃণালকে মেঝে থেকে তুলে তার কোলের উপরে বসায়। মৃণালকে ডাক বিভা একবার ডাক দিলেই সে বিভার কোলের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এই জায়গাটিতেই সে যেন বীরের মতো থাকত। হয়তো গর্ব করে মনে মনে বলত— "আয় দেখি কে আসবি আয়; তোদের আমি ভয় করি না।"

বিভা আর অচলা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। বাইরে যে ঝড় উঠেছে, সেটা দুরন্ত বাতাসের বন্ধ জানালার ওপর আছড়ে পড়ার শব্দ শুনেই বোঝা যায়। এমন সময়ে দরজার উপর জোর করে একটি ধাক্কার শব্দ শোনা যায়। কেউ দরজা খুলে তাদের ঘরে ঢুকেছে। বিভা আর অচলা দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে সেই দিকে তাকায়। হ্যারিক্যানের অল্প আলোতেই দেখা যাচ্ছে, সুপর্ণ এসেছে তাদের ঘরে। সে একবার বিভোর দিকে তাকায়, তারপর অচলার দিকে তাকিয়ে বলল- মৃণাল কে নিয়ে একবার তোর ঘরে যা তো অচলা আমার বিভার সাথে কিছু কথা আছে।

অচলা কোনো কথা না বলেই মৃণাল কে বিভার কোল থেকে তার কোলে তুলে নেয়। এই সময় মৃণালের মুখ যে রাগে এবং ভয়ে আরক্ত হয়ে উঠেছে, সে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সে কিছু বলবার আগেই- অচলা তাকে নিয়ে নীচে চলে গেল। সুপর্ণ এসে খাটে বিভার পাশে বসল। তারপর সে বলল- আমি কিছুতেই আমার প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারব না, বিভা। সে ক্ষমতা আমার নেই।

বিভা ঠাট্টা করে বলল- হঠাৎ করে এমন দিকভ্রম হল কেন?

সুপর্ণ বলল- তোমাকে না পাওয়ার আক্ষেপে আমি একদিন এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু আজ তোমাকে ফিরে পেতে যদি আমার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করতে হয়, তবে আমি তাই করব।

- সে না হয় করলেন। তারপর আমার জীবনে আপনাকে যখন সবথেকে বেশি দরকার হবে তখনই আপনি সরে যাবেন কোনো না কোনো ভাবে। আমি আজ নেহাতই এখানে এসে পড়েছি তাই নইলে তো কোনোদিন জানাই হত না সত্তিটা। তার থেকে আমার এই একার জীবনই ভালো। সারাজীবন একা থাকব আর একা হয়েই মরব।

সুপর্ণ বিভার হাত দুটো টেনে ধরে বলল- বিভা! এমন কথা বলোনা। কিন্তু আমিও তো তোমার প্রতি অবিচার করতে পারি না। সারাজীবন তোমাকে কষ্ট দেওয়ার অধিকার তো আমার নেই।

বিভার চোখ দিয়ে দু ফোটা জল গড়িয়ে যায়। এই মৃদু আলোয় সুপর্ণ সেটা দেখতে পায় না। কিছুক্ষন্ন নিঃশব্দে কাটানোর পর সুপর্ণবিভার হাতটা নিজের বুকের মধ্যে ধরে বলল - বিভা, আমায় ছেড়ে যেও না। তুমি চলে গেলে আমিও আমার প্রানটাকে আর ধরে রাখতে পারব না।

কথাটা শুনে সুপর্ণর হাতের মধ্যে বিভার হাতটা কেঁপে ওঠে। সুপর্ণ সেটা বুঝতে পেরে হাতটা তপরও জোর করে জাপটে ধরে।

বিভা বলল - আপনি সমাজ পরিবর্তনের এক মহান দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন। আপনার শিক্ষার্থীদের নিজের ছাঁচে গড়ার জন্য নিজেকে তো সবসময় সজাগ থাকতে হবে। আপনি যদি আজ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন, তবে তারা কী শিখবে? আপনাকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে তারা কীভাবে মেনে নেবে? আজ না হোক কাল তো তারা বুঝবেই, যে আপনিও আপনার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন স্বার্থের জন্য। তখন তারাও ব্যক্তিগত সুখ শান্তির জন্য স্বার্থপর হয়ে উঠবে। দুনিয়াটা যেমন ছিল তেমনই থেকে যাবে। আর আমার কথা বাদ দিন। আমি একজন সাধারণ মানুষ মাত্র। মরে যাই বা বেঁচে থাকি তাতে কারোর কিছু এসে যায় না। হয়তো আমি মরে গেলে কেউ কাঁদবেও না আমার জন্য।

সুপর্ণ রেগে গিয়ে বিভার হাতটা ছেড়ে দিয়ে কান্না ভেজানো গলায় বলল- তবে তুমি মর, আজই মরে যাও। তাহলে আমাকেও আর দোটানার মধ্যে পড়তে হবে না।

বিভা এবার হা হা করে হেসে বলল- তাতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

- হ্যাঁ।

- বেশ। এতেই যদি সবদিক দিয়ে ভালো হয়, তবে তাই করব।

- কী করে মরবে তুমি?

বিভা মজা করে বলল- ভাবছি বিষ খেয়ে মরব। ভালো হবে না?

সুপর্ণ আরও রেগে যায় - খুব ভালো হবে। পুরোটা খেয়ে ফেলো না আমার জন্যও একটু রেখো।

বিভা হেসে বলল- এতে আবার ভাগাভাগি কীসের?

- আমি তোমাকে স্ত্রী বলে নাই মানতো পারি, কিন্তু তুমি তো আমাকে স্বামী বলো মান, তাই আমাকে না দিয়ে তুমি বিষ খেতে পারবে না।

- তবে আমি বরং গলায় দড়ি দেব।

সুপর্ণ এবার রেগে গিয়ে উঠে পড়ে। তাকে উঠে পড়তে দেখে বিভা মুচকি হেসে বলল- উঠে পড়লেন যে?

- আমার আর এই রসিকতা ভালো লাগছে না। আমি চললাম।

বাইরে প্রবল বেগে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বিভা এতক্ষন লক্ষই করেনি। সুপর্ণকে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে বলল- দাঁড়ান। বাইরে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। এখন যাবেন না।

সুপর্ণ বলল- তাতে তোমার কী? আমি ভিজে ভিজেই যাব।

- তবে যান। আপনি আমার বারন শুনবেন কেন? আর আমারও সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা হবে না।

সুপর্ণ বিভার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল- ভয় দেখাচ্ছো নাকি?

- আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি?

- না।

-তবে যান।

সুপর্ণ এবার কোনো কথা না বলে আবার ফিরে এসে খাটের ওপর বসে। তখন অচলাও মৃণালকে নিয়ে উঠে এসে বলল- ও সই, আর রাখতে পারছি না। তোমার ছেলে, তুমিই সামলাও এবার ওকে।

বিভা মৃণালকে নিজের কোলে নিয়ে বলল- আজ আর ঝড় বৃষ্টি থামবে বলে মনে হচ্ছে না তো। অচলা দরজা থেকে বেরিয়ে বারান্দার রেলিং-দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে বলল- না গো সই, আজ আর ঝড় বৃষ্টি থামবে না। যদু দাদা, তুমি বরং আজ রাতটা এখানেই থেকে যাও।

সুপর্ণ আগের মতোই চুপ করে বসে থাকে। বিভা সুপর্ণর দিকে তাকিয়ে বলল- সেই ভালো। আপনি আর মৃণাল বরং এই ঘরে থেকে যাবেন আমি আর সই, সই-এর ঘরে থেকে যাবো। মৃণাল এবার বিভার গলা জড়িয়ে ধরে বলল- না, আমি, মায়েল কাচে তাকব।

সুপর্ণ এতক্ষণ পর একটু হেসে বলল- আমার কাছে থাকতে আর ভালো লাগে না বুঝি তোর ?

মৃণাল বলল- না, আমাল ভয় কলে।

বিভা বলল- ওকি মৃণাল, ভয় কীসের? তুমি তো তোমার যদু দাদার কাছে থাকবে।

- না, আমি তোমাল কাছে তাকব।

অচলা বলল- তাহলে আজ না হয় মৃণাল আমাদের সাথে নীচের ঘরেই শুয়ে যাবে।

মৃণাল হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলল - না,না, আমি নীচে তাকব না। সেকানে কুব অন্নকার। আমি এই ঘলেই সুবো।

সুপর্ণ বলল- থাক এত চিন্তার কিছু কারণ নেই। বিশ ক্রোশ দূরে পথ তো আর না, আমি চলে যাব।

- পথ যতই বেশি না হোক; জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেই এই বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া যায় । আপনি বরং খাটের উপর শুয়ে পড়বেন আর আমি আর মৃণাল নীচে বিছানা করে শুয়ে যাব ।

- কিন্তু বিভা...

- আর কোনো কিন্তু করবেন না, বিভা বলল।

কথাটা শেষ হতেই অচলা বিভাকে টেনে নিয়ে ঘরের থেকে বারান্দায় যায়। গিয়ে বলল - ঝড় ওঠার আগেই আমি আমাদের দুজনের খাবার এনে রেখেছিলাম। কিন্তু যদু দাদাকে কি খেতে দেব এখন?

বিভা বলল– তুমি বরং আমার খাবারটা ওনাকে দিয়ে দিও। আর হ্যাঁ, কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবে যে, বাড়তি খাবার আনা ছিল।

- তবে আমিও খাব না সই।

- সে কী? কেন?

- ওই খাবারটা বরং যদু দাদাকে দিয়ে দেব আর আমরা দুজনে মুড়ি-চানাচুর খেয়ে নেব, আমার ঘরে আছে।

- তবে তাই কর। চল আমরা নীচে যাই, মৃণালকে ওর খাবারটা খাইয়ে দিই আর তুমি বরং সুপর্ণর খাবারটা উপরে দিয়ে যাও।

১৯

খাওয়া দাওয়ার পর বিভা, মৃণালকে নিয়ে মেঝেতে বিছানা করে । সুপর্ণ খাটে শুয়ে শুয়ে পড়েছে । ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব এখনও একই ভাবে চলছে। জানালা-দরজা বন্ধ । ঘরটির মধ্যে হ্যারিক্যানের মৃদু আলোয় যেন এক অনুজ্জ্বল নিস্তব্ধতা গাঢ় হচ্ছে। বিভা মৃণালের দিকে পাশ ফিরে শুয়েছিল। মৃণাল তার ক্ষুদ্র বামহাতটি দিয়ে বিভাকে দিয়ে বিভাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিভার চোখে ঘুম নেই।

খাটে শুয়ে থাকা মানুষটির চোখেও ঘুম নেই। বিভার কত সুখের দিন আজ । আজ তার স্বামী, সন্তান সকলেই তার কাছে। কত সুখের সংসার তার । কিন্তু পরক্ষণেই বয়ে যাওয়া বাতাসের মতো সেই পুরনো মনখারাপটা এসে দোলা দেয়। কিছুই তার নয়, তার স্বামীও তার নয়, তার সন্তানও তার নয়। তা না হোক! বিভা যে বাস্তবটাকে ভুলে যেতে চায়! যেন ভাবতে থাকে যদি এমনটা হত। যেন সুপর্ণর স্ত্রী হয়ে তার সংসারে ফিরে গেছে, সেই প্রাচীন ঘরটিতে তার কত কাজ, মৃণাল এদিকে ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তার খাবারের থালা হাতে করে নিয়ে বিভাও তার পেছন পেছন ছুটে বেড়াচ্ছে। দুপুর বেলা মৃণাল যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ঘরের মধ্যে একা একা বসে তার মায়ের কথা মনে পড়ছে। সেই সময় সুপর্ণ স্কুল থেকে ফিরেছে। তার চোখে জল দেখে সুপর্ণ তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে আর বলছে- "দুঃখ কেন করছে বিভা? তোমার কষ্ট হলে আমি কী করে থাকি বলতো দেখি ?” আর তখন তার মনে হবে সেই সমস্ত

মেয়ে গুলিকে, যারা সুপর্ণকে নিজের স্বামীর মতো ভালোবাসে । তাদেরকে দেখিয়ে দিতে যে, তারা যতই সুপর্ণকে ভালোবাসুক সুপর্ণ শুধু তাকেই ভালোবাসে, তার কাছেই তার সমস্ত মন প্রাণ বাঁধা দিয়েছে।

কিন্তু হায়! এসব তার ভাগ্যে কোনোদিনই জুটবে না। আবার সেই মনখারাপ! বিভোর চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে গিয়ে বালিশে পড়ে - এসব কথা ভাবতে ভাবতে আর কাঁদতে কাঁদতে বিভার গলা শুকিয়ে পড়ে। তাই সে জল আনতে

নীচে যাবার জন্য যখনই দরজার সামনে আসে, সুপর্ণ পেছন থেকে তার হাত টেনে ধরে বলল- কোথায় যাচ্ছ তুমি?

বিভা দেখে তার চোখদুটি জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করে আপনি ঘুমোননি এখনও?

সুপর্ণর কোমল ঠোঁট দুখানা কেঁপে ওঠে। সে বলল - তার অপেক্ষাতেই ছিলে বুঝি? আমি কখন ঘুমিয়ে পড়ি আর তুমি-

বিভা বলল- আর আমি কী? ও! আপনি ভেবেছিলেন। আপনি ঘুমিয়ে পড়ার আমি মরতে চলে যাব? তা যদি যাইও আপনার অত চিন্তার কী আছে ? আপনি তো নিজেই আমায় মরতে বলেছিলেন।

সুপর্ণ বিভার হাত সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল- তবে মরোগে।

বিভা সামান্য হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসে,তারপর পিছন ফিরে দেখে সুপর্ণও তার পিছন পিছন আসছে।

– আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

সুপর্ণ বলল- আমিও যাব তোমার সাথে।

বিভা হাসল- আমার গলার দড়িটা বুঝি আপনিই বেঁধে দেবেন? নাকি আমার পায়ের তলা থেকে ঠেকনাটা সরিয়ে দেবেন, কোনটা?

সুপর্ণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে যেন দুজন দুজনের অন্তরের কথা দেওয়া নেওয়া করছে। তারপর বিভা একটাদীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল- আপনি ভেতরে যান। আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে, আমি একটু জল খেয়ে আসছি।

– আমিও যাব। আমারও জল তেষ্টা পেয়েছে।

- মৃণাল একা আছে।আপনি ওর কাছে যান । আমি আপনার জন্য জল নিয়ে আসছি।

- তুমি যদি আর না আস?

বিভা মুচকি হেসে বলল- বললাম তো আসব। আপনি এখন ঘরে যান, না হলে বৃষ্টির ঝাপটে এখানেই ভিজে যাবেন।

- বেশ, যাচ্ছি। তবে মনে রেখো কারোর জল তেষ্টা পেলে তাকে কখনো ফেরাতে নেই।

বিভা আর কোনো কথা না বলে নীচে চলে যায়। সুপর্ণও দুদন্ড দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের ভিতর চলে যায়। কিন্তু ঘরে গিয়ে সে কিছুতেই শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারল না, একবার ভাবল ছুটে নীচে যাবে কিন্তু তার পরেই মৃণালের দিকে তাকাল। কেন যে সে তখন বিভাকে ওভাবে কথাটা বলতে গেল! এমন সময় মৃণাল পাশ ফেরে। কিন্তু বিভাকে না খুঁজে পেয়ে খানিকক্ষণ এধার ওধার দেখেই কান্না জুড়ে দেয়। সুপর্ণ তাকে কলে তুলে নিয়ে বলল- কী হয়েছে, কাঁদছো কেন?

মৃণাল ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল- মা যাব।

- মা এখুনি আসছে, তুমি চুপ কর!

মৃণাল চুপ না করে একই ভাবে বলতে থাকে - আমি মা যাব,আমি মা যাব।মা...

এরপরই বিভা ছুটে আসে। সে মৃণালকে সুপর্ণর কোল থেকে কোলে নেয়- কী হয়েছে মৃণাল, কাঁদছো কেন? আমি কোত্থাও যায়নি, এই তো আমি।

মৃণাল তার কান্না থামিয়ে বলল- তুমি কোথায় গিয়েচিলে?

- আমি জল খেতে গিয়েছিলাম বাবা, তুমি জল খাবে?

মৃণাল বলল- হুঁ।

বিভা বসে মৃণালকে দু ঢোক জল খাওয়ায়, তারপর বোতলটা সুপর্ণকে দিয়ে বলল- এই নিন।।

সুপর্ণ বোতলটা নেয়। তার জল তেষ্টা যে মোটেও পায়নি সেটা তার জল খাওয়া দেখেই বোঝা গেল। মৃণাল বিভার কোলে বসেছিল। বিভা বলল- নাও মৃনলি এবার শুয়ে পড়।

- না আমি সুবো না। আমি গুমোলেই তুমি আবার তলে যাবে।।

- না, বাবা। আমি আর কোত্থাও যাব না। তুমি ঘুমোও।

- না। আমি গুমোবো না।

- না, সোনা, অমন করতে নেই। আমি তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়।

- না না আমি, ঘুমোবো না।

বিভা এবার সুপর্ণর দিকে তাকায়। সুপর্ণ মৃণালকে তার কোলে তুলে নিয়ে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল- দেখেছো কত অন্ধকার? দেখেছো , কত ঝড় দিচ্ছে? এবার বদমাসি করলে তোমাকে ওই অন্ধকারেই ছেড়ে দিয়ে চলে আসব। সেখানে মাও থাকবে না আর যদুদাও থাকবেনা।

কথাটা শুনে মৃণাল একবার বাইরের দিকে তাকায়, তারপর হুড়মুড়িয়ে সুপর্ণর কোল থেকে নেমে বিভোর কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর বিভার গলা জড়িয়ে ধরে বলল - মা, আমাকে অন্নকারে চেলে দেবে বলচে।

বিভা - তবে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। তাহলেই আর কিছু বলবে না।

সুপর্ণ এসে বিভার পাশে বসেল।

মৃণাল বলল - না আমি ঘুমোবো না। আমার ঘুম পাইনি! যতুদাদা কুব বাজে। মালব যতুদাদাকে এমনি করে - কথাটা বলেই মৃণাল তার ছোট্ট হাত দিয়ে সুপর্ণর হাতের উপর এক কিল বসায়।

বিভা মৃণালের হাত টেনে ধরে বলো - ওকি, মৃণাল, বড়োদের গায়ে হাত দিতে আছে? যদু দাদা তোমায় কত ভালোবাসে বলত?

- তবে যে বলচে আমাকে অন্নকারে ছেলে দেবে ?

সুপর্ণ আবার বলল- দেবোই তো!

মৃণাল বিভার দিকে তাকায়- ও মা?

- নাগো, তোমার যদু দাদা তো তোমার সাথে মজা করছে ! নাও এবার শুয়ে পড়ো দেখি।

- না, আমি সুবো না। আমি অতলার কাচে গান শুনবো।

বিভা বড়ো বড়ো চোখ করে বলল- কী? এত রাতে অচলার কাছে গান শুনবে? সে না ঘুমিয়ে তোমাকে সারা রাত ধরে গান শোনাবে?

মৃণাল বলল- তবে তুমি সোনাও।

- এবারে আমি কিন্তু রেগে যাব। ঘুমোও তাড়তাড়ি।

সুপর্ণ বলল – তা একটা গান শোনালেই বা !

– শোনাবো মানে? আমি কী গান জানি নাকি?

- জানো বৈ কী। যার মা গান জানে, তার মেয়ে গান জানবে না এটা তো হতে পারে না।

- হায়রে! রাত দুপুরে দুই ছেলেতে আমায় পাগল করে দিল রে?

সুপর্ণ বলল- আমি বুঝি তোমার ছেলে?

- তা নইলে এমন করে কেউ জ্বালাতন করে?

মৃণাল আবার বলল- ওমা, গাও না মা।

- কী জ্বালাতনে পড়লাম বাবা! এত রাতে আবার গান গাওয়া। তা আমার কিন্তু বাংলা গান মনে নেই। হিন্দি গান শুনবি?

মৃণাল হাততালি দিয়ে বলল- হিন্নি গান শুনবো, হিন্নি গান।

বিভা বলল- তুই জানিস হিন্দি গান কী?

মৃণাল বলল- জানি। তন্দ দাদা আমাকে ফোনে হিন্নি গান সোনায়।

- তাই নাকি, চন্দ্র দাদা তোকে ফোনে গান শোনায়? ঠিক আছে দাঁড়া একটু ভেবে দেখি কোনো গান মনে পড়ে কিনা।

তুই বরং তোর যদু দাদাকে বলে দে পরে যেন সে না বলে যে রাক্ষসীতে গান ধরেছে।

সুপর্ণ বলল- যদু দাদা কক্ষনো এমন বলবে না। তুমি বরং গান ধরো।

বিভা বলল- তা আমি কিন্তু তোর অচলার মতো গান বাঁধতে পারব না, আমি আমার শোনা গানই শোনাচ্ছি।

Hum tere pyaar mein sara aalam

Kho baithhe hai kho baithhe

Tum kahate ho ke aise

Pyaar ko bhul jaao bhul jaao

Hum tere pyaar mein sara aalam

Kho baithhe hai kho baithhe

Tum kahate ho ke aise

Pyaar ko bhul jaao bhul jaao

Hum tere pyaar mein sara aalam

Panchhi se chhudaakar us kaa

Ghar tum apne ghar par le aaye

Ye pyaar kaa pinjaraa man bhaya

Hum ji bhar bhar kar musakaye
Jab pyaar huaa is pinjade se
Tum kahane lage aazad raho
Hum kaise bhulaaye pyaar tera
Tum apni jubaan se ye naa kaho
Ab tum saa jahaan mein koi nahin
Hai hum to tumhaare ho baithhe
Tum kahate ho ke aise
Pyaar ko bhul jaao bhul jaao
Hum tere pyaar mein sara aalam
Is teri charan ki dhul se hum
Ne apni jiwan maang bhari
Jab hi to suhaagan kahalaayi
Duniya ki najar mein pyaar bani
Tum pyaar ki sundar murat ho
Aaur pyaar humaari pujaa hai
Ab in charanon mein dam nikale
Bas itani aaur tamannaa hai
Hum pyaar ke gangaajal se balam
Ji tanaman apnaa dho baithhe
Tum kahate ho ke aise pyaar
Ko bhul jaao bhul jaao
Hum tere pyaar mein sara aalam

Sapno kaa darpan dekhaa tha
Sapno kaa darpan tod diyaa
Ye pyaar kaa aanchal humane to
Daaman se tumhaare baandh liyaa
Ye ayesi gaanthh hain ulafata ki
Jis ko naa koi bhi khol saka
Tum aan base jab is dil me
Dil fir to kahi naa dol saka
O pyaar ke saagar hum teri
Laharon mein naaw dubo baithhe
Tum kahate ho ke aise
Pyaar ko bhul jaao bhul jaao
Hum tere pyaar mein sara aalam
Kho baithhe hai kho baithhe
Tum kahate ho ke aise
Pyaar ko bhul jaao bhul jaao
Hum tere pyaar mein.

গানের শেষ লাইনটা মৃদু হয়ে বাইরের অঝোর বৃষ্টিতে হারিয়ে গেল। সুপর্ণর চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে। বিভা আজ অবধী কোনোদিন সুপর্ণর কাছে তার ভালোবাসা প্রকাশ করেনি। আজ কী তবে সে এইভাবে তার ভালোবাসা প্রকাশ করল?

যদি তাই হয় তবে সুপর্ণ কীভাবে আজ এই দায় এড়িয়ে যাবে? কীভাবে সম্মান ফিরিয়ে দেবে তার এই ভালোবাসার? কীভাবে ভাঙবে তার এই অভীমান? যে মনে এত রক্তক্ষরণ হয়েছে কীভাবে তার উপশম করবে?

মৃণাল বলল - মা আল একটা গান, আল একটা।

- না, আর না। এবারে তুমি ঘুমোও। নইলে আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।

- না, মা, না। তুমি আমাল পিটে হাত বুলিয়ে দাও,আমি গুমিয়ে যাচ্চি।

বিভা বলল- হ্যাঁ, তুমি শোও আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

মৃণাল শুয়ে পড়ে। বিভা তার পিঠে হাত বোলাতে থাকে।

সুপর্ণ এতক্ষণ পর কথা বলল- তোমার গলার আওয়াজ শুনে এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি গান জানো। কিন্তু এত ভালো গান গাইতে পারো তা জানা ছিল না।

- আমি মোটেও খুব ভালো গান গাইতে পারি না। আপনার কানের দোষ।

- তা হবে হয়তো। তবে তোমার আর একটি ছেলেকে ঘুম পাড়াবে না?

বিভা হেসে বলল- সে ছেলে বড়ো হয়ে গেছে, নিজে নিজে ঘুমোতে পারবে।

- মোটেও না। বিয়ের আগে তুমি যখন আমার সাথে ঝগড়া করতে, তখন আমি যেন মৃণালের থেকেও ছোটে হয়ে যেতাম।

– তা আপনিও কী মৃণালের মতো, আর ও একটা গান শোনানোর জন্য বায়না ধরবেন নাকি ?

- বায়না ধরলে, তুমি কী আমাকেও ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় দেখাবে নাকি?

- ভয় দেখাতে যাব কেন? আমি সত্যি সত্যিই... কথাটা শুনে সুপর্ণর বুকটা কেঁপে ওঠে, সারা শরীর যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল – তা বটে।

তারপর মেঝে থেকে উঠে গিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে। বিভা তেমনি ভাবেই সেখানে বসে থাকে। সে তার একটি মাত্র কথা দিয়ে নিজেকে আর সুপর্ণকে যে কতটা আঘাত করেছে সেটা বুঝতে পেরে একেবারে স্থির হয়ে বসে থাকে।

২০

বিভা মৃণালকে স্নান করাচ্ছে এমন সময় অচলা উপরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল - সব্বনাশ হয়ে গেছে সই।

বিভা স্নান করানো বন্ধ করে অচলার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল - কী হয়েছে? তুমি হাঁপাচ্ছো কেন?

- আমাদের টুকটুকি বড়ো জ্বরে পড়েছে গো!

- সে কী ? চলতো দেখি - বলেই বিভা মৃণালের গায়ে একমগ জল ঢেলে দিয়ে একটা গামছা জড়িয়ে কোলে তুলে নেয়। অচলা, বিভোর হাত টেনে ধরে বলল - কী হবে সই?

বিভা বলল- চিন্তা করছো কেন? জ্বর তো হতেই পারে।

- কোরোনা নয় তো?

- না না সই, অমন কথা বলতে নেই। তাছাড়া এখান থেকে কেউ বেরোয়ও না আর কাউকে ঢুকতে দেওয়াও হয়না।

তাহলে এই রোগ আসবে কোত্থেকে ?

অচলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভয়ার্ত স্বরে বলল- আমি একটা ভুল করে ফেলেছি সই।

- ভুল! কী ভুল করেছো?

- প্রায় হপ্তাখানেক আগে টুকটুকির মা এসেছিল, টুকটুকির সাথে দেখা করতে। কিন্তু তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তার শরীর ভালো ছিল না, খুব কান্নাকাটি করছিলেন মেয়ের সাথে দেখা করার জন্য। আমি সেটা দেখে চুপ করে থাকতে পারিনি। রাতের বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে আমি টুকটুকিকে তার মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর দুদিন আগে চন্দ্র দাদা খবর দেয় টুকটুকির মায়ের নাকি কোরোনা হয়েছে।

- এ তুমি কী করেছো সই? জানোনা এ রোগ কত ছোঁয়াচে? কী করে তুমি এ কাজ করলে?

অচলা কেঁদে ফেলল - আমি বুঝতে পারিনি সই। ভেবে ছিলাম একটুক্ষণ দেখা করলে কী আর এমন হবে?

- একটু সময় হোক বা বেশি সময় হোক, এ যে ছোঁয়াচে রোগ। টুকটুকি যদি আর দুদিন পর দেখা করত, তা হলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ? সকলে এতবার ধরে বারণ করার পরও তুমি কী করে এ কাজ করলে?

অচলা বলল- আমি মুখ্য-সুখ্যু মানুষ। অত, বুঝিনি, তাই… কী হবে সই ?

- জানিনা। চল দেখি তার এখন কী অবস্থা।

বিভা, অচলা আর মৃণাল টুকটুকির ঘরে গিয়ে দেখে, সে বিছানায় শুয়ে আছে। সুপর্ণ, চন্দ্রনাথ, আনন্দ ঠাকুর বাকি ছেলেমেয়ে গুলি সকলেই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

মৃণাল হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করে- তুক দিদিল কী হয়েচে মা ?

বিভা মৃণালকে অচলার কোলো দিয়ে টুকটুকির কাছে যায়। তার কপালে হাত দিয়ে জ্বরের পরিমান দেখে। তারপর

জিজ্ঞাসা করে – ডাক্তার ডাকা হয়েছে?

চন্দ্রনাথ বলল- খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উপসর্গ শুনে বলেছে, সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

সুপর্ণ বলল - সেই তো চন্দ্র, কী হল বল দেখি!

আনন্দ ঠাকুর এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন চুপচাপ। বিভাকে টুকটুকির কাছে যেতে দেখে বললেন- ওর কাছে যেও না মা। অ্যাম্বুলেন্স আসছে। এক্ষুনি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

কিছুক্ষন পর অ্যাম্বুলেন্স এসে টুকটুকিকে নিয়ে চলে যায়।

বিভা সুপর্ণর কাছে গিয়ে বলল - আপনি মৃণালকে কিছুদিন আপনার কাছেই রাখুন। তবে বাড়ি থেকে বেরোতে দেবেন না , আর আপনিও বেরোবেন না।

সুপর্ণ বলল- কিন্তু, টুকটুকির তো কোরোনা নাও হতে পারে।

- না হলেই তো ভালো। কিন্তু… আমি যা বললাম ওইটে করুন আপনি।

- বেশ।

এই বলে সুপর্ণ মৃণালকে নিয়ে তার ঘরের দিকে চলে যায়। বিভাও তার ঘরে ফিরে আসে। বাকি সকলেও ফিরে যায়। অচলা পাথরের মূর্তির মতো বিভোর পেছন পেছন তার ঘরে আসে। সকলেরই দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না।

দুদিন পর টুকটুকির রিপোর্ট আসে। সে সত্যি করোনা আক্রান্ত হয়েছে। খবরটা শুনে সুপর্ণ চিৎকার করে বলে ওঠে- এটা কি করে হতে পারে?

সেখানে চন্দ্রনাথ, বিভা আর অচলাও ছিল। চিৎকার শুনে অচলার বুক কেঁপে উঠেছিল। সে একটা আওয়াজও তার মুখ দিয়ে বের করতে পারল না।

সুপর্ণ চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বলল- খবর নে চন্দ্র। কী করে রোগ এই আশ্রমে প্রবেশ করেছে। টুকটুকি নিশ্চয় কোথাও বেরিয়েছিল। নইলে এরোগ এল কোথা থেকে?

টুকটুকির ব্যাপারটা জানানো প্রয়োজন মনে করে বিভা ভয়ে ভয়ে জানায় - আমিই টুকটুকি কে তার মায়ের সাথে রাতে বেলায় দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই তাঁর আজ এই অবস্থা। তিনজনেই অবাক হয়ে বিভার মুখের দিকে তাকায়।

চন্দ্রনাথ বলল- সে কী? তার মা তো করোনা আক্রান্ত!

- হ্যাঁ, কিন্তু টুকটুকি যখন তার মায়ের সাথে দেখা করে তখন তিনি যে আক্রান্ত এটা জানা যায়নি। তাই...

কথাটা শুনে সুপর্ণর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। কোন সাহসে তুমি তাকে, তার মায়ের সাথে দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিলে? এই পরিস্থিতি জেনেও এই কাজটা কি করে করলে?

চন্দ্রনাথ শান্ত ভাবে সুপর্ণ কে বলল- শান্ত হ সুপর্ণ, যা হবার হয়ে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকলকে টেস্ট করাতে হবে।

সুপর্ণ, চিৎকার করে বলতে থাকে- তুই চুপ কর চন্দ্র। আগে মহারানীকে জিজ্ঞাসা কর্, সে কেন এমন করল? বুদ্ধি-সুদ্ধি কী নেই তার? দুদিন এই আশ্রমে আশ্রিতা হয়ে আছে বলে যা ইচ্ছে তাই করবে? নাকি সে ঠিক করে নিয়েছে এই আশ্রমটাকে শেষ করে তবেই যাবে। সুপর্ণর কথা গুলো শুনে বিভার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সে কোনো কথা না বলেই নিজের ঘরের দিকে দৌড়ে চলে যায়। অচলা কী করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে সেও বিভার পেছন পেছন দৌড়ে যায়। গিয়ে দেখে বিভা বিছানা উপর উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে। সে বিভার কাছে গিয়ে বলল- এ তুমি কী করলে সই? আমার দোষটা নিজের ঘাড়ে নিলে কেন?

বিভা উঠে বসে, হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছে বলল- দোষ যারই হোক ব্যাপারটা জানানো প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া আমি এই আশ্রমের দুদিনের আশ্রিতা মাত্র। আমার দোষ গুন কেও চিরটাকাল মনে রাখবে না।

অচলা কেঁদে ফেলল- না, সই অমন করে বলো না।

দুদিন পার হয়ে গেছে। আশ্রমের সকলের টেস্ট করা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট আসেনি এখনও। আজ সকাল থেকেই বিভার শরীরটা ভালো ছিল না, দুপুরে একবার ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন সুপর্ণও মৃণালকে কোলে নিয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়েছিল মৃণাল বিভাকে পেয়ে, 'মা যাব, মা যাব ' বলে কেঁদে উঠেছিল। সে সবসময় বিভার কাছেই থাকত, শুধু রাতটুকু সুপর্ণর কাছে থাকত। কখন কখনও রাতেও সে বিভার কাছেই থাকত। কিন্তু এই দুদিন সে একবারও বিভার কাছে আসতে পায়নি। তাই বিভাকে দেখতে পেয়ে অমন করে কেঁদে উঠেছিল। সুপর্ণর রাগ তখনও কমেনি। সে কোনো কথা না বলেই মৃণালকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলেগিয়েছিল।

বিকেল দিকে বিভার শরীরটা আরও খারাপ হয়। ঘরে বসে থাকতে ভালোলাগছিল না বলে, সে পুকুর পাড়ে গিয়ে একলা একলা বসেছিল। তাকে উদাস ভাবে বসে থাকতে দেখে অচলা জিজ্ঞাস করল - কীগো সই, অমন করে বসে আছো যে?

বিভা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল - আমাকে মা ছাড়া আর কেউ ভালোবাসে না জানো। তাই ভাবছি তার ঘরেই ফিরে যাব। সে যা করে হোক আমি চলে যাব। কিন্তু এখানে আর থাকব না।

কথাটা শুনেই অচলা আঁতকে ওঠে। সে সেখান থেকে উঠে গিয়ে সোজা সুপর্ণর বাড়ির দিকে ছুটে যায়। সুপর্ণ তখন বসার ঘরে বসে ছিল। মৃণাল, ঘরের ভেতর ঘুমোচ্ছিল।

অচলা সুপর্ণর পায়ের কাছে পড়ে কাঁদতে থাকে। অচলাকে কাঁদতে দেখে সুপর্ণ বলল - কী রে অচলা? কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?

অচলা কাঁদতে কাঁদতে বলল- তুমি সই-এর উপর আর রাগ করে থাকো না। তার কোনো দোষ নেই। তাকে একবার আটকাও।

সুপর্ণ অবাক হয়ে বলল- আটকাবো মানে?

- সে যে আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে বলছে !

- হঠাৎ করে তোমার সই এর মতিভ্রম হল কী করে?

অচলা কাঁদতে থাকে- তার কোনো দোষ নেই যদুদাদা। আমাকে বাঁচানোর জন্য সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছে।

সুপর্ণ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে- মানে?

অচলা সুপর্ণকে সমস্ত কথা জানায়। সব কথা জানার পর সুপর্ণ বিহ্বলের মতো চেয়ে থাকে, তারপর বলল- এটা তুই কী করলি অচলা? না জেনে তাকে কত কথা শুনিয়েছি, কত রাগ দেখিয়েছি, কত কষ্ট দিয়েছি।

- তুমি আর দেরি করো না যদু দাদা, একটি বার তার কাছে চল।

- তুই মৃণালের কাছে থাক। আমি আসছি - এই বলে সুপর্ণ বিভার কাছে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যায়। পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখে বিভা সেখানে ধুলো বালির উপর শুয়ে পড়েছে।

২১

সুপর্ণ বিভার কাছে ছুটে গিয়ে দেখে, তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এসেছে। প্রবল জ্বরে সে কাতরাচ্ছে। সুপর্ণ, বিভার মাথাটা তার হাতের মধ্যে তুলে ধরে।

সুপর্ণকে দেখে বিভা ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল- ছোবেন না আমাকে। এই রোগ যে বড় ছোঁয়াচে। আপনি চলে যান এখান থেকে।

সুপর্ণর গলায় যেন কাঁটা বিঁধি গেছে। বিভার এই অবস্থা দেখে তার চোখ দুখানা জলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। সে বিভার কথাগুলোকে কোনো গুরুত্ব না দিয়েই বিভার হাঁটুর নীচে একহাত আর ঘাড়ের নীচে অন্য হাত তাকে তার বুকের কাছে তুলে ধরে। বিভাও চোখ বুজে সুপর্ণকে জড়িয়ে ধরে। তারপর সুপর্ণ, বিভাকে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। অচলাকে বলল- যা শীঘ্রি চন্দ্রকে খবর দে, বিভাকে এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

অচলা চলে যায়, বিভা বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে সে যেন হাপাচ্ছে। তারপর তার দুর্বল হাতটা দিয়ে সুপর্ণকে ঠেলা দিয়ে বলল - আপনি যান এখান থেকে। আপনি বসবেন না এখানে।

সুপর্ণর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভার হাতটাকে তার বুকের কাছে টেনে এনে বলল - আমকে ক্ষমা করে দাও বিভা। আমি না জেনে তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।

বিভা তার হাত টাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল- তবে আমিই চলে যাচ্ছি। এই বলে উঠে বসে পড়ে। কিন্তু বসে পড়তেই তার মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। সে হেলে পড়তেই সুপর্ণ তাকে জড়িয়ে ধরে। বিভা সুপার্ণর জামার কলার টা ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল- আমি.. আমি আর পারছি না। আপনি চলে যান চলে যান এখান থেকে।

কিছুক্ষণ পরই বিভাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সুপর্ণ তার কাছে ছিল বলে সুপর্ণকেও নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় চোদ্দো দিন তাদের হাসপাতালেই কাটে।

আশ্রমের অনেকেই করোনা আক্রান্ত হয়। কিন্তু তাদের সকলেই প্রায়, সুস্থ হয়ে যায়।

সুপর্ণ ও করোনা অক্রান্ত হয়। কিন্তু তোর কোনো রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়নি। আজ বিভাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সকাল দশটা নাগাদ সুপর্ণ এসে বিভার কাছে দাড়ায়।

সুপর্ণ বলল- চল তোমাকে আজ ছেড়ে দেওয়া হবে। আমাকেও ছেড়ে দিয়েছে। তুমি এখন পুরোপুরি সুস্থ।

বিভা জিজ্ঞাসা করল - আশ্রমে যাদের কোরোনা হয়েছিল, তারা সকলে সুস্থ হয়ে গেছে তো?

- সকলেই। শুধু একজন বাদে।

- কে?

সুপর্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল - মৃণাল। তার অবস্থা ভালো না।

বিভার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যায়- সে কী?! আমি এক্ষুনি তার কাছে একবার যাব।

- বেশ চল। কিন্তু দূর থেকেই তার সাথে দেখা করতে পারবে।

- হ্যাঁ, তাই হবে। আপনি আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন।

সুপর্ণ আর বিভা মৃণালের কাছে যায়। মৃণাল জেগেই ছিল। প্রথম প্রথম মৃণাল, বিভা বা সুপর্ণ কারো সাথেই কথা বলেনি। তারা তাকে একা একা ছেড়ে দিয়েছে, একবারও দেখা করেনি তার সাথে, তাই অভিমান করেছিল।

তারপর বিভা যখন বলল- তুই যদি আমার সাথে কথা না বলিস, তবে আমি চলে যাবো।

তখন মৃণাল হাও হাও করে কেঁদে ওঠে- যেও না ,আমাকে ছেলে যেও না।

মৃণালকে কাঁদতে দেখে বিভা তাকে কোলে নেওয়ার জন্য দু হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পাশে থাকা একটি নার্স বাধা দিয়ে বলে- পেশেন্টকে ছোয়া যাবে না।

মৃণাল ওই নার্সটার দিকে তাকিয়ে বলল- মানবো তোমাকে। ওতা, আমার মা। আমি মায়েল কাচে যাবো।

নার্সটি বলল - হ্যাঁ, বাবা, তুমি মায়ের কাছে যাবে তো। আগে তুমি সুস্থ হয়ে যাও, তার পরই তোমার মায়ের কাছে যাবে। তখন তোমায় কেউ আটকাবে না।

সুপর্ণ বলল- তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হও। তোমাকে আমি অনেক খেলনা কিনে দেব। অনেক চকলেট কিনে দেবো।

মৃণাল পা ছুঁড়েতে থাকে - না আমি, তকলেট কাবো না, আমি মায়েল কাচে যাবো।

নার্সটি মৃণালের মাথায় হাত দিয়ে বলল- ওরকম করে না সোনা তুমি এখন যদি তোমার মায়ের কাছে যাও, তবে তোমার মা আবার অসুস্থ হয়ে যাবে, তুমি কী চাও তোমার মায়ের কষ্ট হোক?

মৃণাল কোনো কথা বলল না। তার নাকের ছিদ্র দুটি ফুলে উঠল। ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল । তারপর অশ্রু-টলমল চোখে সে বিভার হাতের লাল পলাটির দিকে চেয়ে রইল।

বিভা সেটা দেখে মৃণালকে জিজ্ঞাসা করল- তুমি নেবে এটা?

মৃণাল কোনো কথা না বলে শুধু ঘাড় নাড়ালো। বিভা তার হাতের থেকে পলাটি খুলে মৃণালের হাতে দিল তারপর বিভা নার্সটিকে বলল- ওটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নেবেন না প্লিজ, ওটা ওর কাছেই রেখে দেবেন। ওটা ওর খুব শখের জিনিস।

বিভা আর সুপর্ণ চলে যায় । মৃণাল বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতে থাকে তার মা ও যদু দাদা তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

২২

বিভারা হাসপাতাল থেকে কাল ফিরে এসেছে। কিন্তু এই আশ্রমে তার কিছুতেই ভালোলাগছিল না। মৃণাল নেই যে তার কাছে। সে ঘরে বসে বসে মৃণালের কথাগুলি ভাবছে এমন সময় সুপর্ণ তার ঘরে এসে দরজার চৌকাঠের উপর বসে পড়ে। তাকে এই অবস্থায় দেখে বিভা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল – কী হয়েছে আপনার?

সুপর্ণ কিছুক্ষন চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। তারপর দরজার কপাটে মাথা গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে বলল- মৃণাল চলে গেছে। সে সারাজীবনের মতো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

বিভা যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে সুপর্ণর সামনে বসে পড়ে বলল- চলে গেছে মানে?

- মৃণাল কিছুক্ষন আগেই মারা গেছে।

বিভা একটা ঢোক গিলে বলল – না না, আপনার কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। আপনি হয়তো ভুল শুনেছেন।

সুপর্ণ, তেমনি করেই কেঁদে চলে।

- আপনি… আপনি ভুল শুনেছেন। মৃণালের কিচ্ছু হয়নি। আপনি এমন কথা কেন বলছেন? কেন?

- মৃণাল চলে গেছে বিভা। সকলকে ছেড়ে চলে গেছে। চলে গেছে…

- না ! না এসব মিথ্যে। মৃণাল আসবে আমার কাছে। মৃণাল আসবে তার মায়ের কাছে…বিভা মেঝের উপর উপুড় হয়ে হাও হাও করে কাঁদতে থাকে।

ঘন্টা দুই পরে বিভা, সুপর্ণ আর চন্দ্রনাথ শ্মশানে যায়। সেখানে মৃণালের শরীরটা একাটা কালো প্লাস্টিকে মোড়া। হাসপাতালের লোকেরাই প্লাস্টিক থেকে মৃণালের দেহটা বের করে চিতার উপর তুলে দেয়। সে তখনও বিভার হাতের লাল পলাটা দুই হাত দিয়ে তার বুকের উপর চেপে ধরে আছে। সে চিরকালের মতো তার

চোখের পাতা বন্ধ করেছে। সে তার ওই ছোট্ট দুখানা পাপাড়ির মতো চোখ মেলে আর কখনও চেয়ে দেখবে না, অনুসন্ধান করবে না। মা মা বলে অস্থির করে তুলবে না। দৌড়ে গিয়ে কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না। ছোট্ট হাতটা তুলে কারোকে বলবে না “মায়েল কাচে যাব”, বলবে না “যতুদাদা মালব তোমাকে”, বলবে না “অতলার কাছে গান শুনব”, আর ভয় পাবে না “অন্নকারে”। তার এই ক্ষুদ্র শরীরটা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না, সেই সঙ্গে তার অভিমান গুলিও। এত দিন ধরে মাকে কাছে না পাওয়ার অভিমান, যদুদাদাকে কাছে না পাওয়ার অভিমান।

শ্মশান থেকে ফিরে আশ্রমে এসে সুপর্ণ দেখে তার ঘরের সামনে একটি ছোট্ট ছেলে ঘোরাঘুরি করছে। সে ছুটে গিয়ে তাকে মৃণাল বলে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তারপরই দেখে সে মৃণাল নয়। কিন্তু তা দেখেও তাকে আবার জড়িয়ে ধরে। কাঁদতে কাঁদতে বলে- মৃণাল, তুই কোথায় গেলি বাবা? আর একবার ফিরে আয় না? আর একবার?

ওই ছেলেটি খানিক অস্বস্তি বোধ করে। তারপর একসময় ছুটে পালায়। সুপর্ণও উঠে ঘরে আসে। সেখানে ঘরের একটি কোনাতে মৃণালের খেলনা গুলি পড়ে ছিল, কাগজের নৌকা, দম দেওয়া পুতুল, একটি কাঠের ঘোড়া, ছোটো ছোটো হাড়ি-কড়াই, থালা বাটি, সেগুলিতে সে ঘাস পাতা দিয়ে রান্না করত। কচি কচি ঘাস পাতাগুলিও শুকিয়ে পড়ে আছে। সেগুলিকে রান্না করারও কেউ নেই আর পরিবেশন করারও কেউ নেই।

সুপর্ণ শুনতে পায়, কে যেন দূর থেকে কিছু বলছে -

ও মা, তুই এসেছিস নাকি শ্মশান ঘাটে?
কালো প্লাস্টিকে মোড়া এই শরীরটাকে দেখতে?
ছুঁস না মা যেন, দেখে যা দূর থেকে,
রোগাক্রান্ত সেই দেহটা জ্বলল কেমন করে।
দেড় বছরের রক্তমাংসের প্রাণটাকে পোড়াতে-
কোনো কষ্টই তো করতে হল না, আগুনটাকে।
যদি উঠতাম বেঁচে আর একবার
তোর কোলের 'পরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম আরও সহস্রবার।
আমার সকাল- সাঁঝের আবদার,
এই জলন্ত কাঠের উত্তাপ
বাষ্প হয়েছে একবার নয়, বারবার।
তোর হাতের লাল পলাটা এখন শুধু আমার ,
শেষ নিঃশ্বাসে এইটুকু প্রাপ্তির আশ্বাস।
ও যদু দাদা, তোমার আমার রান্নাবাটির খেলায়;
পরিবেশনটা না হয়, শেষ হল এই বেলায়।

কত দিনের সেই লুকোচুরি খেলায়;
হারিয়ে দিলে আমায়, এত অবহেলায়?
ও অচলা, পালালি নাকি, তোর সুর ছেড়ে?
পালালি নাকি, তোর ছন্দ ছেড়ে?

২৩

কয়েকদিন পরে দিন রাতের বেলা সুপর্ণ তার ঘরে লাইট নিভিয়ে বসেছিল। হঠাৎ করে কেউ একজন ঘরে প্রবেশ করে লাইট জ্বলায়। সুপর্ণ চমকে ওঠে, দেখে বিভা তার ঘরে এসেছে। একবার বিভার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর মুখ নিচু করেই জিজ্ঞাসা করল- তুমি এত রাতে এখানে এসেছো কেন?

- কাল আমি ফিরে যাচ্ছি।

- ফিরে যাচ্ছো মানে? কোথায় যাচ্ছো?

বিভা বলল- আমার ঘরে। যাতায়াতের জন্য বাস ট্রেন চালু হয়ে গেছে। চন্দ্রনাথ আমার জন্য বাসের টিকিট কেটে এনেছে।

সুপর্ণ প্রথমে কোনো কথা বলল না। তারপর বলল - দাদাঠাকুর জানে?

বিভা উত্তর দিল - হ্যাঁ, জানে।

- তবে তো দেখছি সকলেই জানে। তা আমাকে কী জন্য জানাতে এসেছো?

- আপনার আশ্রিতা হয়ে এত দিন থাকলাম আর আপনাকে জানাবো না?

সুপর্ণ একটু হেসে বলল - আমার কাছে সবাই থাকতেই আসে , কিন্তু যাবার সময় কেউ বলে যায় না। কেউ অনুমতিও নেয় না আমার। যার যখন ইচ্ছে হয় চলে যায়। তুমিও চলে যেতে পারো।

বিভা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সুপর্ণ আবার কথা বলল- কাল কখন যাবে তুমি?

- কাল, ভোরে।

- তবে আর কী! যাও চলে যাও।

- আপনি নিজের শরীরের খেয়াল নেবেন। জানি মৃণালকে ভুলতে পারবেন না, তবুও ভোলার চেষ্টা করবেন।

কথাটা বলে, বিভা যখনই যাবার জন্য পিছন ফিরে দাঁড়ায়, তখনই সুপর্ণ তার হাতটা টেনে ধরে বলল- আর একটা

দিনও কী থাকা যায় না?

বিভা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাটের উপর বসে পড়ল সুপর্ণর পাশে।

- আমাকে আর আটকাবেন না। আমি আর এখানে থাকতে পারব না। সেখানেই যাচ্ছি, মনে হচ্ছে, মৃণাল আমার পেছন পেছন দৌড়ে আসছে, এই বুঝি আমার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই বুঝি দৌড়ে এসে আমার কোলের উপর হুড়মুড়িয়ে পড়বে। চকলেট খাওয়ার জন্য বাই বায়না করবে। আমি আর পারছি না। এবার আমি এখান থেকে গিয়ে একটু মুক্ত হই।

সুপর্ণ বলক- তুমি না হয় মুক্তি পাবে। কিন্তু আমি কী ভোবে মুক্তি পাবো সেটাও বলে দিয়ে যাও। গলায় দড়ি দিতেও পারব না, আত্মহত্যা করা যে মহা পাপ!

- এরকম কথা বলবেন না। মৃণাল তার ছোটো ছোটো অনুভূতি গুলোকে আপনার সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে দিয়ে গেছে। ছোটো ছোটো প্রাণগুলো বড়োই চঞ্চল। চোখের আড়াল হলেই তারা পালায়। কিন্তু তারা সদ্য ফোটা ফুলের মতো। যতই ছেড়ে পালাক তার গন্ধটা থেকেই যায়।

- সেই গন্ধটাই যেন আমার শ্বাস রোধ করে দিচ্ছে বিভা। আমিও যে আর পারছি না।

– তবুও আপনাকে বাঁচতে হবে। আজ পৃথিবীতে কত কত বাবা-মা তাদের সন্তান হারিয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে ছোটো ছোটো স্বপ্ন গুলো দেখেছিল সেগুলো শেষ হয়ে গেছে। তাবলে কী তারা বাঁচাবে না ?

ভবিষ্যতে আপনার হাত ধরে পুরো সমাজটা উঠে দাঁড়াবে। আপনি যদি আজ সমাজের হাত ছেড়ে দেন, তবে কী করে চলবে?

- সকলে শুধু মুখেই বলতে পারে। সব দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে দিতে পারে। আমার এই রক্ত মাংসের শরীরটার ভেতরেও যে একটা মনুষ আছে, তার ও ভালো লাগা মন্দ লাগা আছে সেটা কেউ বোঝে না। কেউ না।

বিভা বলল- আপনি যেদিন এই নিরন্ন মানুষগুলোর জন্য যুদ্ধে নেমেছেন, সেদিনই তো আপনার শরীর, মন, প্রাণ সব কিছু যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিয়ে দিয়েছেন। তবে আজ দিক ভ্রম হচ্ছেন কেন?

- যুদ্ধ শুরু করার আগেই আমি মৃণালের কাছে পরাজিত হয়ে গেছি। সে আমার এই শরীরটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে অনেক দূরে পলিয়েছে, অনেক দূরে।

সুপর্ণ এবার বিভার হাতটা তার বুকের উপর চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল- কেন মৃণাল আমাকে ছেড়ে পালাল? আমি কি তাকে কোনোদিন অবহেলা করেছি? যদি পালাবেই তবে এসেছিল কেন আমার কাছে? আজ মনে হচ্ছে বিভা তুমিই ঠিক, ভগবান মানুষের হাতে গড়া মূর্তি মাত্র; জীবন্ত নন, তিনি কিছু নন, কেউ নন।

বিভা আর কিছু কথা বলতে পারল না। শুধু হাত দিয়ে সুপর্ণর হৃৎস্পন্দন অনুভব করল। তারপর কিছুক্ষন পর বলল- কেন জানিনা আজ মনে হচ্ছে ভগবান আছেন। অনেক দূরে কোথাও তিনি আছেন। এখন হয়তো মৃণালের সাথে তিনি খেলা করছেন অথবা মৃণালকে কোলে নিয়ে আমাদের দেখছেন। হয়তো সেখানে আমার মা আছে, বাবা আছে। আপনার মা, বাবা আছেন। তারা তাদের আদরের নাতিকে অনেক যত্নে রাখেছেন। আসলে তারা অনেক ভালো মানুষতো তাই এই দুঃখ কষ্টের দুনিয়া থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। তারা নিশ্চয় খুব ভালো আছে ভগবানের কাছে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বিভা আবার বলল- আপনি খেয়েছেন কিছু ?

সুপর্ণর চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত জলের ধারা বয়ে যেতে লাগল।তারপর বিভা তার হাতটা সুপর্ণর হাতের থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা থালাতে করে কিছু খাবার নিয়ে এসে সুপর্ণকে বলল খেয়ে নিন।

সুপর্ণ, তার কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে যাওয়া চোখগুলো তুলে বিভার দিকে তাকায়, বলল- তুমি কোনো মেয়ে মানুষ নও । তুমি কাঁদতে জানোনা। তোমার কষ্ট হয়না। তুমি কোনো মায়াবিনি।

সত্যিই এই মেয়েটি যেন নবচেতনার নতুন কোনো স্রষ্টার হাতে গড়া। যে তার হৃদয়টিকে কোনো বীরপুরুষের হৃদয়ের মতো করে গড়েছে। মস্তিষ্ককে সবসময় সচল রাখার শক্তি দিয়েছে, জগতে মানব গুলিকে সৌন্দর্যে চমক লাগিয়ে দেওয়ার মতো বা মানবীদের মধ্যে ঈর্ষানুভূতি জাগিয়ে তোলার মতো রূপ দিয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিভা বলল- তাই হোক, আমি কোনো মায়াবীনাই। আর জ্বালাতন করবেন না, আমার শেষ কথাটা রাখুন।

সুপর্ণ আর কোনো কথা না বলে খাবারের থালাটি হাতে নিয়ে কিছুটা খাবার খেল, কিন্তু তারপরই সমস্ত খাবার বমি করে দিল। বিভা তার পাশেই বসেছিল, ফলে বমির কিছুটা অংশ তার কাপড়েও এসে লেগেছিল। বিভা একটুও অস্বস্তি বোধ না করে, সুপর্ণর মাথায় হাত দিয়ে বলল- কেন আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন? আপনাকে তো সুস্থ থাকতে হবে। সারাটা জীবন আপনার দায়িত্ব আপনাকেই পালন করতে হবে। এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনাকে দেখবে কে?

সুপর্ণ বিহ্বলের মতো চেয়ে রইল বিভার দিকে।

বিভা বলল - যান, জামাটা বদলে আসুন। কী হল যান?

বিভা সুপর্ণকে একপ্রকার ঠেলা দিয়েই জামা বদলাতে পাঠাল।

সুপর্ণ জামাবদলে ফিরে এসে দেখে বিভা জায়গাটা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

- আপনি এসব করতে গেলেন কেন?

- আজ আমি আছি তাই পরিস্কার করে দিয়েছি। কিন্তু কাল যখন আমি থাকব না, তখন আপনাকেই এসব করতে হবে। তাই বলছি, নিজের শরীরের দিকটাও দেখুন।

সুপর্ণর অভিমান হল - তাতে তোমার কী? আমার শরীর, আমি বুঝে নেব।

- দেখুন, যা ভালো বুঝবেন করুন। আমি চললাম।

সুপর্ণ আবার আর্ত সুরে ডেকে উঠল – বিভা! আর এক দিন অন্তত থাকো।

- এখানে মাটিতে এক পা চলতে গেলেও যেন পায়ে কাঁটা ফুটে যাচ্ছে; এখানের হাওয়া-বাতাস আমার শ্বাস রোধ করে দিচ্ছে। কতদিনের সেই মা মা করে ডাকা আওয়াজটা আমার বুকে শাঁড়াশির মতে চিপে ধরছে। আমাকে আর থাকার জন্য অনুরোধ করবেন না।

- তবে তো তুমি স্বার্থপর হয়ে গেলে। নিজের পালানোর রাস্তা আছে বলে এই অসুস্থ মানুষটাকে একলা ফেলে পালাচ্ছ?

বিভা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল- আমাকে গোছগাছ করতে হবে, আমি চললাম।

কথাটা বলেই চোখের নিমেশে বিভা চলে গেল, সুপর্ণ বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা গোড়ায় সিঁড়িটাতে বসলো। চারিদিকে নীবিড় অন্ধকার। আসমানে শুকনো একটুকরো ঝুলন্ত চাঁদটাও ফ্যাকাসে। বাতাস ও হালকা হালকা দিচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে একটা শরীরে ধাক্কা খেয়ে যেন থেমে গেছে। তারা হয়তো, কান পেতে শুনছে আর বলছে- "দেখ দেখ, পোড়ার মুখো হার্টটাও আবার দুলাতে দুলতে গান ধরেছে।”

২৪

পরের দিন ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ বিভা ঘুম থেকে উঠে। স্নানের ঘরে যায়। স্নান টান সেরে এসে বেরবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। অচলা তার ঘরেই ছিল।

- তোমার এই রূপখানা আবার দেখতে পাবো তো সই?

- কেন, আমাকে না দেখলে বুঝি আমাকে মনে রাখবে না?

- তা কী আমি বলেছি? তোমার এই সই, তোমাকে কোনোদিন ভুলবে না। তবুও তোমাকে আবার দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকব।

- তুমি আমার বাড়ি এসো কিন্তু, আমি তো সেখানে একা থাকি।

- তবে এখানেই থেকে যাও না, সই ?

- না। তা হয়না, আমি বিপদে পড়েছিলাম, তাই দুদিনের আশ্রিতা হয়ে ছিলাম মাত্র।

- হয়তো এসেছিলে আশ্রিতা হয়ে; কিন্তু এখন তুমি তোমার ঘর সংসার ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছো।

এতক্ষন গোছগাছের জন্য বিভার হাতের চুড়িগুলি ঝনঝন করে আওয়াজ করছিল। অচলার এই কথাটি শুনে তা থেমে গেল। বিভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল - ঘর সংসার আমার কোনোদিন ছিলই না, তবে তা ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?

অচলার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বিভা তার কাছে গিয়ে বলল- কাঁদছো কেন সই? তুমি আবার কোনো সই পেয়ে যাবে।

অচলা বলল - পেলেও আর কারোকে সই করব না। নয়তো সেও তোমার মতো ছেড়ে পালাবে।

- তবে তাকে ধরে রাখার কোনো মন্ত্র শিখে নিও। আর একটা কথা বলব সই?

- বলো।

- তুমি সুপর্ণর একটু খেয়াল রেখো। তার শরীরটা ভালো নেই । এতবড় একটা রোগ থেকে এই ভালো হয়েছে, কিন্তু মৃণালের জন্য– কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারল না বিভা ।তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। সে চোখ বন্ধ করে খাটের উপর বসে পড়ল । দুফোঁটা চোখের জ্বল তার গাল দিয়ে গড়িয়ে গেল। তারপর তার ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বলল- চলো সই আমাকে এবার যেতে হবে, নইলে বাসটা আর পাব না ।

অচলা বিভার হাতটা তুলো তারা হাতের মধ্যে রাখল। তারপর হঠাৎ করে চমকে উঠে বলল - এ কী সই? তোমার পলাটা কোথায়? নিজের করা প্রশ্নতে অচলা নিজেই চমকে ওঠে। তার মনে ছিল না যে মৃণালের সাথে সাথে তার ছোটো ছোটো দুই হাত দিয়ে চেপে রাখা বিভার পলাটার চিতার আগুনে জ্বলে উঠেছিল। অচলা আর বিভার দিকে তাকাতে পারলনা। বিভা তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নীচে চলে গেল।

তখন অন্ধকার অল্প কেটেছে। সুপর্ণ তখনও সেই দোর গড়াতেই বসে বসে দরজায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তারপর কোনো এক মহিলার হেঁটে আসায় অওয়াজে তার ঘুম ভাঙে।

বিভা তাকে দেখে বলল- আপনি সারারাত এখানে বসেছিলেন কেন?

- দেখেছো যখন , তখন ঘরে ডেকে নিয়ে যাওনি কেন?

- আর এই রকম ছেলে মানুষী করবেন না। ভাল থাকবেন। আমি চলি।

সুপর্ণ বিভাকে ডেকে বলল- বিভা, একটা কথা বলব?

- বলুন।

- আমি মরে গেলে আমায় কি একটিবার দেখতে আসবে?

এই গভীর অন্ধকারে বিভার মুখ যে কান্নায় আর ভয়ে কতটা ভরে উঠেছিল, তা সুপর্ণ দেখতে পেল না। বিভার কন্ঠস্বর গলায় এসে আটকে গেল। সে আর কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল।

এগোতে এগোতে সে শুনতে পেল - স্বার্থপর, এ দুনিয়ার সবাই স্বার্থপর।

২৫

একদিন দুপুর বেলায় আনন্দ ঠাকুর সুপর্ণর ঘরে এল, সুপর্ণ তখন বিছানায় শুয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল। শরীরের বেশ অবনতি হয়েছে তার। তার সেই সুশ্রী, স্নিগ্ধ মুখখানা শুকিয়ে গেছে। ঠাকুর এসে তার পাশে বিছানায় বসতেই সে ঠাকুরের মুখের দিকে করুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে অল্প হাসল।

ঠাকুর দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল- এ আমি কী শুনছি যদু্ দাদা, তুমি নাকি চন্দ্রনাথকে বলেছো, তোমার অবর্তমানে এই আশ্রমের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে?

সুপর্ণ জবাব দিল- আপনি ঠিকই শুনেছেন দাদা ঠাকুর।

- এ হেয়ালির কারণ জানতে পারি কী?

- কারণ আর কী , চন্দ্রনাথকে তো আমি ছোটো থেকে দেখছি, তাকে এই আশ্রমের দায়িত্ব দিলে ভুল কিছু হবে না ।

- আমি তা বলছি না, চন্দ্রনাথকে আমি জানি। কিন্তু এখন অহেতুক একথার মানে কী?

- দেখছেনই তো, শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। কতদিন আর এ শরীর থাকবে জানি না।

- আর তোমার দায়িত্ব? সেও কী তোমার শরীরের সাথে সাথে দুর্বল হয়ে পড়েছে?

সুপর্ণ মুখ ঘুরিয়ে বলল- জানিনা, হয়তো তাই ।

- তবে তাকে সবল করার কোনো চেষ্টাও: তো তোমার মধ্যে দেখছি না।

- আমি ব্যর্থ হয়েছি দাদাঠাকুর। আমার দ্বারা এতবড় প্রতিজ্ঞা পালন করা আর সম্ভব হল না।

- যার জন্য নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত ছেড়ে দিলে, তার থেকেই এখন পালাচ্ছো?

কথাটা শুনে সুপর্ণর দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, আপনি কী করে জানলেন ?

- আমি সব জানি এই কিছুক্ষণ আগে থেকে I চন্দ্রনাথ আমায় সব বলেছে। কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারছি না, তুমি তাকে তোমার কাছে রাখলে না কেন?

- আমি তাকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নিজেই চলে গেছে।

- তবে তাকে জোর করে ধরে রাখলে না কেন?

- সে অধিকার আমার আর কোথায় !

- কেন, সে তো তোমার স্ত্রী?

- তা কী করে হয়। আমি রাধামাধবের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি যে।

- কী প্রতিজ্ঞা করেছো, যে তুমি কারকে কোনোদিন বিয়ে করবে না? সে প্রতিজ্ঞা রাধামাধব মেনে নেবে ভেবেছো?

- কেন মানবে না?

- তুমি না জানো, কিন্তু তিনি তো জানেন যে তুমি বিবাহিত। তাছাড়া ঈশ্বর কী রাধামাধবের ওই মূর্তির মধ্যে থাকেন? তিনি তো থাকেন প্রতিটি শরীরের ভেতরে। প্রতিটি প্রাণের ভেতরে। তাকে দেখতে পাওয়া যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। তোমার ভেতরের সেই মন মেনে নিয়েছে যে বিভা তোমার স্ত্রী, তবে তোমার শরীর কেন মানছে না ?

সুপর্ণ বলল- যদি তাইই হয়, যদি আমি বিভাকে আমার স্ত্রী বলে মেনেই নি, তবে লোকেরা কী আমাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে মেনে নেবে? তারা কী আমায় আগের মতো মানবে ?

ঠাকুর হাসলেন- এই দেখো, এটা যে একেবারে ছেলেমানুষ মতো কথা হয়ে গেল! তোমার শরীর আর মন যতদিন না একত্রিত হচ্ছে, ততদিন কোনো কাজই তুমি করতে পারবে না। সে এক ছোটো কাজই হোক বা সমাজ পরিবর্তনের এক মহা প্রতিজ্ঞাই হোক। নিজের কোন কাজে কী ফল হবে সেটা কখনও চিন্তা করতে নেই। মানুষের, সমাজের সামগ্রিক উন্নতির কথা ভাবতে হয়। সেই জন্য হয়তো অনেক সময় প্রতিজ্ঞাও ভাঙতে হয়, কখনও কখনও মিথ্যাচারও করতে হয়, কিন্তু যুদ্ধের শেষে জয়লাভের পর সেগুলিও মৃত সৈনিকের মতো যুদ্ধ ক্ষেত্রেই শেষ হয়ে যায়। তাতে কোনো দোষ নেই।

সুপর্ণ এবার কেঁদে উঠল- বিশ্বাস করুন দাদা ঠাকুর আমি বিভা কে আমার স্ত্রী বলে মেনে নিতে চেয়ে ছিলাম, কিন্তু সে আমার কথা শোনেনি। সমস্ত দুঃখের ভার আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে চলে গেছে। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাকে আটকাতে পারিনি। সেই বলেছিল আমি যদি স্বার্থপর হয়ে উঠি, তবে অন্যরাও আমার কাছ থেকে এটাই শিখবে।

- আমি তো তাকে দেখেছি যদু দাদা, সে এক অদ্ভুত মেয়ে। অন্য মেয়ে হলে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যেত। কিন্তু সে যত আঘাত পেয়েছে তত নিজেকে ঘা মেরে শক্ত করে নিয়েছে। তাই ঝড়ের শেষ ক্ষন পর্যন্ত একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে সকলকে নিজের মতো মনে করেই ভুল করেছে।

- আমিও তো তাই বলছি, সে অনেক আঘাত পেয়েছে। এখন যদি একটু শান্তি পেয়েছে, তবে তাই নিয়ে থাক। হয়তো অন্য কোথাও বিয়ে করে সুখে থাকবে।

ঠাকুর হাসল - সে তুমিই ভেবে দেখো। আমি এখন চললাম, যদি পারো নিজেকে তোমার স্ত্রীর মতো করে গড়, এখনও সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি।

ঠাকুর চলে গেল। সুপর্ণ কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো চেয়ে থাকল। একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল। হঠাৎ করে কার যেন এসে তার মাথার কাছে খাটের উপর বসে পড়ার চাপে খাটটা মচ্ করে উঠল।

সুপর্ণ চমকে উঠে বলল- কে?

একটা বহুদিনের প্রতীক্ষিত স্বরে উত্তর এল- আমি । যদি চিনতে পারেন, যদি না ভুলে গিয়ে থাকেন, তবে চিনে নিন।

সুপর্ণ তার হাতটা টেনে এনে বুকের কাছে চেপে ধরে বলল- আমি যদি স্বপ্ন না দেখে থাকি বিভা, তবে তোমায় আর ছাড়ব না। এই যে হাতটি ধরলাম, মরণকাল পর্যন্ত ছাড়ব না।

বিভা হাসল - আমি এখানে মরতে আসিনি, বাঁচতে এসেছি। আর আপনাকে শাস্তি দিতে এসেছি।

সুপর্ণ চমকে উঠল। বিভা কি তাহলে সত্তিই এসেছে ? শাস্তি দেবে?! তবে দোষটা জানতে পারি কী?

- পারেন বৈকী। ওই যে আমার চলে যাবার দিনে আপনি বিনা দোষে আমাকে স্বার্থপর বলেছিলেন, সেটারই শাস্তি দিতে এসেছি।

- কি শাস্তি দেবে ঠিক করেছো?

বিভা এবার তার মাথাটা সুপর্ণর বুকের উপর রেখে বলল স্বার্থপর অপবাদ যখন পেয়েছি তখন আমিও বুঝিয়ে দেবো স্বার্থপর কাকে বলে। আপনি আমায় স্ত্রী বলে মেনে নেন বা না নেন, আমি কিন্তু আমার অধিকার ছাড়ব না ।আমি আপনার স্ত্রী। সারা জীবন আপনার সাথেই থাকব। সে এখানে হোক বা পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে। আমি রাধা নয় আমি রুক্মিণী হয়ে বাঁচতে চায় । আর একটা জিনিস চায় আপনার থেকে ।

সুপর্ণ বিভার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল - কী চায়?
- আমি ছোট্ট মৃণালকে আবার ফিরে পেতে চায়। আমি স্বপ্নে দেখেছি সে আমার কাছে আবার ফিরে আসবে বলেছে।

রাহি

১

-আজ বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। মা বলেছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। যা বলার আছে তাড়াতাড়ি বলো। কথাটা বলতে বলতে আমি বিভানের পাশে এসে বসলাম।

বিভান রেগে যায় - তুই এখনি চলে যা, তোকে আমি আসতে বলেছি নাকি? নিজেই তো আমাকে ফোন করে ডাকলি, নইলে এত কাজের মাঝে কে আসে !

-বেশ আমার ভুল হয়ে গেছে ; তুমি তোমার কাজ নিয়েই থাক আমি চললাম।

-বাব্বা, এত রাগ! তা কাল থেকে এই রাগ কাকে দেখাবি শুনি?

- রাগ কেন করতে যাব ? রাগ আমি তার উপরই করি যে আমার....

- যে তোর ... ? ওহ... তুই তার কথা বলছিস, যাকে তুই এখনও পর্যন্ত তোর মনের কথাটা বলতেই পারলি না ?

আমি আর বিভানের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না । ওর চোখের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মুখটা নিচের দিকে করে বললাম - হুম্।

বিভান বলল-কাল তো তুই প্যারিস চলে যাচ্ছিস, যাবার আগে একবার তাকে সব কথা বলেই দে না ?

- না, সে অন্য কারোকে ভালোবাসে। সে অন্য কারোকে নিয়ে ভালো আছে। আমি কেন বলবো তাকে? তাছাড়া সে ভালো থাক, আমি শুধু এটাই চাই। আর কিছু না।

- তাহলে তুই নিজের পরিবার, আপনজন সকলকে ছেড়ে এত দূরে কেন চলে যাচ্ছিস? শুধু মাত্র ওই একটা মানুষের জন্য সকলকে কেন কষ্ট দিচ্ছিস?

-আমি কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যাচ্ছিনা। আমি আমার জীবনটাকে নিয়ে আবার নতুন ভাবে বাঁচতে চাই, আমি এখানে থাকলে মরে যাব বিভান! তাছাড়া প্যারিসের এত ভালো একটা কলেজে যখন অ্যাডমিশন পেয়েছি তখন সেই সুযোগ আমি হারাতে চাই না।

-হুম, বুঝলাম।

চারিদিকটা বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। কাল আমি এত দূরে চলে যাচ্ছি বিভান, অথচ তোমার মনে লেশ মাত্র দুঃখ নেই ! আমার জন্য তোমার মনে কোনো কষ্ট নেই, কোনো অনুভূতিই নেই। এর পরও আমি কীভাবে বলবো যে আমি তোমায় ভালোবাসি? তাই তো আমি এত দূরে চলে যাচ্ছি। তোমার সামনে আমি আর থাকতে পারবনা। আমি ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছি।

কী রে, দীপাসা? কী এত ভাবছিস ? কথা বলছিস না যে?

বিভানের হাতের একটা ঠেলা খেয়ে আমি আমার ভাবনা থেকে আবার বাস্তবে ফিরে আসি। বললাম- না, তেমন কিছু না। তারপর, তোমার রাহি কেমন আছে?

- হ্যাঁ, ভালোই আছে। মেয়েটা বড্ড জেদি। এত অভিমান করলে যে, কী বলব!

বিভানের কথাটা যেন আমার গলা টিপে ধরল। তবুও আওয়াজ বেরোলো তার থেকে- তার অভিমান ভাঙানোর জন্য কোনো মানুষকে কাছে পেয়েছে বলেই তো অভিমান করে। ওটাকে অভিমান বলে ধরো না, ওটা কাছে তোমাকে আরও কাছে পাওয়ার অভিনয় ।

-হবে, হয়তো।

- বিয়ে কবে করছো?

- রাহি যেদিন রাজি হবে।

– তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছো বুঝি?

- না।

- তবে?

– এখনও আপাতত বিয়ের কথা ভাবিনি। পড়া কমপ্লিট করি তারপর বলব না হয়।

আমি কিছুক্ষন চুপ থেকে বললাম – ততদিনে সে যদি অন্য কারোর হয়ে যায় ?

- হবে না।

- বাব্বা! এত কনফিডেন্স ?

-হ্যাঁ, সে শুধু আমার, আমার একার। আর কারোর না।

- যাক, তাও ভালো।

-হুম, তখন থেকে তুই শুধু আমার আর রাহির কথা বলে যাচ্ছিস। নিজের কথা বল এবার। তোর মনের মানুষের নামটা অন্তত বল।

- কী করবে তার নাম জেনে ?

- কী আবার করব? তুই যখন এখানে থাকবি না; তখন তার সাথে যোগাযোগ করে সে কেমন আছে, কি করছে, সেটা তোকে জানিয়ে দেবো।

-কোনো দরকার নেই। আমি তাকে ভুলে যেতে চাই। তাছাড়া আমি তোমার নম্বরও ডিলিট করে দিয়েছি আমার ফোন থেকে।

- আমার নম্বর ও .....! কেনরে? আমি আবার কী করলাম?

- না তুমি কিছু করোনি, কিন্তু আমি তোমার সাথে আর যোগাযোগ রাখতে চাই না। তুমি রাহিকে নিয়ে ভালো থাকো।

- সে না হয় বুঝলাম; কিন্তু আমার সাথে যোগাযোগ না রাখার কী আছে ?

-ছাড়ো না, আমার এসব কথা বলতে ভালো লাগছে না।

- না তোকে বলতেই হবে। তুই হঠাৎ আমার সাথে এমন কেনো করছিস? আমি কি কিছু অন্যায় করেছি তোর সাথে? বা আমার কোনো কাজে তুই কি কষ্ট পেয়েছিস?

আমার এই আলোচনাটা আর ভালো লাগছিল না। এটাকে অন্য দিকে ঘোরানোর জন্য আমি অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এলাম- বিভান, তোমার ড্রইং-এর কাজ এখন কেমন চলছে?

- দেখ তুই কিন্তু কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিস। বলনা আমাকে কেনো এমন করছিস?

- তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করলাম সেটা বলোনা?

- তিন মাস আগে একটা এঁকেছিলাম, তারপর থেকে আঁকার মতো আর কিছু মনেই ধরেনি।

- কী ছিল? ল্যান্ডস্কেপ ভিউ? নাকি পোর্ট্রেট ভিউ ?

- পোর্ট্রেট ভিউ।

- কার ছবি এঁকেছিলে?

- রাহির।

-বাহ, ভালো। আমি বিভানের কথাগুলো আর সহ্য করতে পারছি না, খুব কষ্ট হচ্ছে , রাহির কথা শুনতে শুনতে মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে যাচ্ছে আর বুকের ভেতরে একটা চাপা কষ্ট হচ্ছে - সন্ধ্যে হয়ে গেলো বুঝলে। অন্ধকারে এভাবে দুজনে পুকুর পাড়ে একা একা বসে থাকা ঠিক হবে না। চলো বাড়ি ফিরে যাই।

বিভান হা হা করে হেসে উঠল- আকাশে পূর্ণ চাঁদ। জলে তার পূর্ণ প্রতিফলন। অন্ধকার কোথায়? আর এত গাছ পালা, আমি; তার পরও নির্জন কোথায় ?

- কাল সকাল ৮টার মধ্যে আমাকে বেরোতে হবে , অনেকটা জার্নি আছে। আজ একটু রেস্ট নিই ঘরে গিয়ে।

- গোছগাছ সব হয়ে গেছে ?

-হ্যাঁ।

- প্যারিসে সব ঠিকঠাক করা আছে তো? কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না তো সেখানে গিয়ে?

- না। কোনো অসুবিধে হবে না, আমার বাবার পরিচিত একজন ওখানে থাকে, ওই একই কলেজে পড়ে। ওই সব ঠিক করে রেখেছে।

- আচ্ছা তুই যে আমার নম্বর ডিলিট করে দিয়েছিস, আমাকে দেওয়া তোর সব কথা কি তুই ভুলে গেলি তাহলে?

-ভুলবো কেন ? তোমাকে সবসময় সব বিপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম I কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন নেই।

– কেন নেই?

- তা বলতে পারব না। প্রয়োজনের থাকলেও বলতে পারো অধিকার নেই।

- তা, তোর অধিকার কে কেড়ে নিল?

- এসব বাজে বকতে আমার আর ভালো লাগছে না।

- হ্যাঁরে দিপাসা? কী হয়েছেরে তোর? কেনো এমন করছিস?

- বললাম তো বাজে বকতে আমার ভালো লাগছে না।

- বেশ্। তুই কী চাস বল?

- আমাদের তিন মাসের পরিচয়। আমি কীই বা চাইতে পারি তোমার কাছে? তাছাড়া আমি যা চাই তা তুমি কি দিতে পারবে ?

বিভান এবার আমার হাতটা তার হাতের মধ্যে রেখে বলল – বলেই দেখনা একবার।

- আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। তার হাতের মধ্যে থেকে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম তার থেকে। নইলে এই আলতো চাঁদের আলোতেও সে আমার চোখের জল স্পষ্ট দেখতে পেত। - কীরে মুখ ফিরয়ে নিলি যে?

– বেশ। কিছু দিতেই যখন চাও, তখন একটা গান শোনাও না!

- গান ? !

– কেন? তুমি তো মাঝে মাঝে গান গাও। আজ আমার জন্য একটা গান শোনালেই বা!

- ঠিক আছে। কিন্তু আমি ভালো গাইতে পারিনা আগেই বলে রাখছি।

- আমি তোমার খারাপটাই শুনতে চাই।

বিভান রবিঠাকুরের একটা গান ধরলো- " আমার মল্লিকা বনে যেদিন প্রথম ধরেছে কলি

আমার মল্লিকা বনে....."

গানটা শেষ হবার পরও সুরতরঙ্গ গুলো যেন অসীম থেকে ছুটে এসে আমার হৃৎস্পন্দনকে থামিয়ে দিতে চাইছে। আমি আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। অবশেষে বিভানই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল- চল। এবার ফিরে যাই তবে?

-হ্যাঁ, চলো,

আমি উঠে পড়তেই বিভান আমার ডান হাতটা ধরে বলল - আজ আমায় একটা কথা দিবি?

- বলো, কী কথা?

- রাহির সাথে যেদিন তোর দেখা হবে, সেদিন থেকে তুই আমাকে ভুলে যাবি।

- মানে?!! এটা কি সম্ভব নাকি ? কারোর সাথে পরিচয় করা মানে কি কারোকে ভুলে যাওয়া?

-না তা নয়। তবে...

-তবে কী?

-হয়তো তুই আমার কাছ থেকে আমার রাহিকে কেড়ে নিতে পারিস তাই।

- তুমি আমাকে এই চিনেছ?

আমার খুব রাগ হলো কথাটা শুনে তারপর নিজেকে কিছুটা শান্ত করে বললাম- চিন্তা করো না, আমি সেরকম কিছু করব না। কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, এখানে তোমাকে ভুলে যাওয়ার কথা আসছে কেন?

- কারণ আমি তোকে আর কোনো কষ্ট দিতে চাই না।

-তাহলে আছে এটা মেনে নিচ্ছো যে, তুমি আমায় কষ্ট দিয়েছো?

- হবে হয়তো।

বিভান যে কি বলে যাচ্ছে, ওর কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না– আমি তোমাকে ভুলে যাব এই কথাটা দিতে পারছিনা, কারণ মনের উপর আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি। তবে তোমার রাহির সাথে পরিচয় হবার পার তোমার সামনে আর কোনোদিন আসব না, এই কথাটা দিচ্ছি।

- যাক, নিশ্চিন্ত হলাম ।

-তা কালই তো আমি চলে যাচ্ছি; তোমার রাহির সাথে কখন পরিচয় করাবে ?

- সেটা এখন সময়ের অপেক্ষাতেই থাক।

- বেশ, তবে তাই। চলো এবার ফিরতে হবে ।

২

এই মাত্র কলকাতা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছালাম, এখন সকাল আটটা। আমার ফ্লাইট দশটা চল্লিশে। এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর থেকে সোজা প্যারিস। আমাকে ছাড়তে বাবা, মা আর বিভান এসেছে। ওহ ! বলাই হয়ে ওঠেনি- বিভান আমার সিনিয়র, আমার থেকে বছর তিনেকের বড়ো। মা-বাবার সাথেই আগে ওর পরিচয় হয়েছিল কোনো একটা বিয়ে বাড়িতে বোধ হয়, তারপর আমার সাথে বন্ধুত্ব। যাই হোক, এখন থাক সে কথা। পরে যদি কোনোদিন তোমাদের সাথে কথা বলায় সুযোগ হয়, সেদিন বলব।

মা বাবাকে, কোনোমতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। বিভানের কী একটা কাজের জন্য রয়ে গেল। কী কাজ তা অবশ্য জানায়নি। আজ ওর সাথে একটাও কথা বলতে পারিনি। ওর দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারিনি। কিন্তু এবার কথাটা না বলে আর পারলাম না – আর কবে দেখা হবে জানিনা, তুমি বলেছিলে রাহির সাথে দেখা করার জন্য আমায় সময়ের অপেক্ষায় থাকতে। আর তো সময় নেই আমার হাতে।

- তা, তোর আর ধৈর্য ধরছে না বুঝি? আমাকে ভুলে যাওয়াটা তোর জন্য এত জরুরি?

- কোনটা জরুরি আর কোনটা জরুরি নয়, এবার না হয় আমাকেই সেটা বুঝে নিতে দাও। আমাকে এবার যেতে হবে।

- হ্যাঁ, আর শোন মন দিয়ে পড়া শুনা করিস। নিজের স্বপ্নগুলো পূরণ করার চেষ্টা করিস।

- আর কিছু?

এই নে- বিভান ম্যাগাজিন এর মত কিছু একটা আমার হতে ধরিয়ে দিল।

- এটা কী!?

-ঋত্বিকা।

-হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এই পত্রিকাটা নিয়ে আমি কী করব?

- পত্রিকা নিয়ে লোকে যা করে তুইও তাই করবি। প্যারিসে গিয়ে তো আর এই বাংলা পত্রিকা পাবি না, তাই এটা রেখেদে তোর কাছে। কখনও বাংলা পড়তে মন গেলে পড়িস। বাংলার শিল্পীদের ছুঁয়ে দেখিস।

- এবার সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি আসি?

বিভান আমার হাতটা ধরে বলল - সত্যিই চলে যাচ্ছিস? বিভানের এই একটা কথা আমার হৃদয়কে এমন ভাবে আঘাত করল যে, মনে হল আমি যেন আমার শরীরের উপর নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেছি। আমার দেহের সমস্ত ভর আমি যেন আমার হাতের মধ্যে দিয়ে ওপর মানুষটির হাতে দিয়ে দিতে চাইছি। তবুও আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কোনোমতে আটকে যাওয়া গলা থেকে স্বর বেরকরে বললাম – আমাকে আটকে রাখার মতো কেউ নেই যে! তুমিও ভালো থেকো। রাহিকে ভালো....আমার কথাটা শেষ হতে না দিয়েই বিভান আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

প্রায় ঘন্টাখানেক পার হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ আগেই আমি কলকাতা ছাড়িয়ে এসেছি। আমার ভেতরে যে কী চলছে, তা আমি জানি না। কী মনে করে পত্রিকার পাতাগুলো অন্যমনস্কভাবে উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, পত্রিকার একটা পুরো পাতা জুড়ে আমার ছবি । একদিন বিভানের সাথে একটা বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছবিটা সেখানেরই। সেই রোজি পিংকের চুড়িদারটা, এলোমেলো চুল দিয়ে মুখের খানিকটা অংশ ঢাকা, অফুরন্ত হাসি, বসন্তের হালকা রোদের জন্য আলতো ভাবে ঢেকে যাওয়া আমার চোখের পাতা, ব্যাকগ্রাউন্ডে অস্পষ্ট বসন্তের সবুজ কচি পাতা আর বাহারি ফুল। ছবিটা বিভানের আঁকা। ওই, ওই তো নিচটায় ওর সইও রয়েছে। আর ছবিটার নামের জায়গাটায় লেখা - রাহি ! তার নীচেই

বিভানের লেখা কয়েকটা লাইন -

মেয়েটাকে সেদিন প্রথম দেখেছিলাম, সেদিন ছিল বসন্ত। বসন্তের বাসন্তীকে হার মানিয়েছিল তার সৌন্দর্য। সেদিন নাম জানা ছিল না তার, বসন্ত চুপিসারে এসে বলেছিল- রাহি, তারপর পরিচয়, বন্ধুত্ব, হাতের উপর হাত রাখা; তার প্রেমিক আছে জেনেও তাকে না ভালোবেসে থাকতে পারিনি। তাকে হারাবো জেনেও, তাকে কাছে পেতে দ্বিধা করিনি। তাই নিজের এই দুই হাতের প্রয়াসে মনের সমস্ত প্রেম উজাড় করেছি দিয়েছি এই ছবিতে। পারলে খোঁজ নিয়ে দেখো সে আর কেউ নয়, সে আমার প্রেম, সে আমার রাহি ।।

সমাপ্তী

১

বলি হ্যাঁগো, আজ হাসপাতাল না গেলেই কি নয়? প্রশ্নটা করব না করব না করে করেই ফেলল শ্রীপর্ণা।

কেন আজ আবার কী হল? - ধ্রুব খানিক দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

আজ বেটুর স্কুলে প্রাইজ গিভিং সেরিমনি। প্রাইজ নেওয়ার পর ও প্রতিবার তোমার কথা, আমার কথা বলে, কিন্তু তুমি কোনোবারেই থাকো না, ওরও তো খারাপ লাগে বল!

না শ্রী; তা হয় না, ওকে এটা বুঝতে দাও যে ওর বাবার ওর একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করার থেকে একজন রোগীকে সুস্থ করে তোলা বেশি প্রয়োজন।

চিরটাকাল এটাই তো বুঝিয়ে এসেছি, কিন্তু কিছু কিছু সময় নিজের বাবারও তো প্রয়োজন হয়।

তো, কী করব আমি? - ধ্রুব চিৎকার করে ওঠে। কাজ-বাজ ছেড়ে দিয়ে তোমাদের প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করব আমি?

সেটা কী বলেছি আমি? - শ্রীপর্ণারও আওয়াজ চড়ে যায়। একটা দুটো দিন আমাদেরও তো কিছু পেতে ইচ্ছে করে? মাঝে মাঝে আমিতো ভুলেই যাই, আমাদের সম্পর্কটা আদৌ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিনা!

I am Sorry. Please যাও এবার এখান থেকে। আমার ভালো লাগছে না।

শ্রীপর্ণা আর কোনো কথা না বলেই রান্নাঘরে চলে যায়। ধ্রুব টেবিলে রাখা হাতঘড়িটা পরেই হাসপাতাল -এর জন্য বেরিয়ে পড়ে। তাঁর নিজস্ব গাড়িতে সে নিজেই ড্রাইভ করে হাসপাতালে যায়। কিন্তু আজ হাসপাতাল যাওয়ার রাস্তাটাতে কয়েক হাজার লোক বসে অনশন করছে। ফলে রাস্তা বন্ধ! এইসব নোংরা রাজনীতি একেবারেই পছন্দ করে না ধ্রুব। তাই বিরক্ত হয়েই গাড়িটা ঘোরালো অন্য একটা রাস্তা দিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য। এই রাস্তাটা বেশ ফাঁকা, দুপাশে গাছের সারি।

সারা রাস্তা জুড়ে কেউ যেন আলো-ছায়ার আলপনা এঁকে দিয়েছে। হঠাৎ করে ধ্রুবর চোখ পড়ল রাস্তার পাশে একটা পোড়ো বাড়ির দিকে। এই বাড়ির দিকে তাকালেই ধ্রুবর মনটা কেমন যেন করে ওঠে। দুনিয়ার সব রোগ যেন এই বাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে, কতটা জীর্ণ আজ সে! কত অসুস্থ! কত বিবর্ণ! ধ্রুব গাড়িটাকে রাস্তার এক সাইডে পার্ক করে বাড়িটার ভেতরে ঢোকে। ভগ্নপ্রায় সিঁড়ির অন্ধ-রহস্য অতিক্রম করে ধ্রুব ছাদে গিয়ে কার্নিসে পা ঝুলিয়ে বসে। এটা তার কাছে নতুন নয়। ছ-বছর আগে প্রতি সপ্তাহের রবিবারটা তার এখানেই কাটত। তখন সে একা নয়, তার সাথে থাকত সমাপ্তী। কত গল্প! কত প্রেম! কত বিরহ তাদের!

২

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার দু-বছর পর ধ্রুবর গার্লফ্রেন্ড তাদের পাঁচ বছরের সম্পর্ক শেষ করে চলে যায় অন্য একজনের সাথে। ধ্রুব তখন একেবারে ভেঙে পড়ে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সব আশা শেষ হয়ে যায় তার। কিছুদিন পরেই তাদের মেডিক্যাল কলেজে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, সেখানে বক্তৃতা দিতে আসে সমাপ্তী। সে কোনো মেডিক্যাল স্টুডেন্ট নয়। সে একজন সাহিত্যিক, তবে সাহিত্যিকের পাশাপাশি সে এক হাই স্কুলের শিক্ষিকাও। অনুষ্ঠানে সমাপ্তী একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে এবং সেটা শুনে ধ্রুবর দুনিয়াটা যেন এক মুহূর্তে বদলে যায়। সে প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেলে সমাপ্তীকে। সমাপ্তীর লেখা বহু বইগুলি পড়তে শুরু করে। সমাপ্তীর লেখা গল্প, কবিতা ধ্রুবকে মুগ্ধ করে দেয়।

তারপর ধ্রুব নিজে একদিন সমাপ্তীকে ডেকে তার বন্ধু হওয়ার জন্য আবেদন জানায়। তারপর থেকে তারা দুজনে প্রতি রবিবার ওই পোড়ো বাড়িটায় দেখা করত। প্রথম প্রথম ধ্রুব তো চুপ করেই বসে থাকত আর সমাপ্তী তার লেখা কবিতা পাঠ করে শোনাত। তারপর একসময় থাকতে না পেরে ধ্রুব বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত, আর তখন সমাপ্তী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলত— "এত কষ্ট পেয়ো না ধ্রুব! দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি তো তোমার পাশে, সারাটা জীবন।" এরকম ভাবেই তাদের সম্পর্কটা ধীরে ধীরে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়। ধ্রুবর মনের সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়।

তখন তারা কার্নিসে পা ঝুলিয়ে বসে থাকত। এরকম করে বছর চারেক কাটল। ধ্রুব তখন ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে সাফল্যের এক বিরাট সীমায় পৌঁছে গেছে। সে একদিন সমাপ্তীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ধ্রুবর বাড়িতে কেউ এই ব্যাপারে তাকে বাধা দেবে না এটা সে জানত। আর সমাপ্তীর বাবা-মা থাকলেও তারা একসঙ্গে থাকে না। সমাপ্তী তাদের জীবনের বোঝা মাত্র। ছোটবেলা থেকে সমাপ্তী হোস্টেলে কাটিয়েছে, তারপরই হাই স্কুলে চাকরি পাওয়ার পর সে একটা ভাড়া ঘরে থাকত। ফলে সমাপ্তীরও কোনো বাধা ছিল না বিয়ের প্রস্তাবে হ্যাঁ বলার জন্য। বিয়ের ঠিক একমাস আগে সমাপ্তী এসে ধ্রুবকে জানায় যে সে বিয়ে করতে

পারবে না। ধ্রুব কারণ জানতে চাইলে সে বলে— সে নাকি অন্য কাউকে ভালোবাসে।

সে ধ্রুবর সাথে কিছু সময় কাটানোর জন্য তার কাছে এসেছিল। এরপর সমাপ্তী ধ্রুবর সাথে দেখা সাক্ষাৎ, যোগাযোগ সবকিছু বন্ধ করে দেয়। তখন ধ্রুবর নিজের জীবনের উপর খুব রাগ হয়। সব সম্পর্কের সমীকরণ শেষ হয়ে যায় তার কাছে। সে ঠিক করে নেয় জীবনে আর কোনোদিন কাউকে ভালোবাসবে না। কিছু মাসের মধ্যে সে শ্রীপর্ণাকে বিয়ে করে ঠিকই, কিন্তু বিয়ের ছয় বছর কেটে যাওয়ার পরও তাদের মধ্যে ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়নি। যেটুকু হয়েছে শুধুই শারীরিক। বসে বসে এই পুরনো কথাগুলোই ভাবছিল ধ্রুব। হঠাৎ করে তার পকেটে ফোনের ভাইব্রেশনটা পেতেই তার জাগরণ হয়। কিন্তু সে পকেট থেকে ফোনটা না বের করেই আবার আনমনা হয়ে যায়। গুনগুন করে গান ধরে—

তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মনরে আমার... গানটা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে ধ্রুব। তারপর পকেটের মধ্যে ফোনটা আবারও ভাইব্রেট করে ওঠে। ধ্রুব ফোনটা বের করে দেখে হাসপাতাল থেকে ফোন।

- হ্যালো?

হ্যালো, স্যার, প্লিজ তাড়াতাড়ি আসুন আপনি। একজন পেশেন্ট-এর অবস্থা খুব খারাপ। ফোনের ওপাশ থেকে একজন নার্স বলল।

- ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি আসছি। কিন্তু কী হয়েছে তার?

- ব্রেন ক্যান্সার, লাস্ট স্টেজ।

- ও মাই গড। প্লিজ ওয়েট, আমি এক্ষুনি আসছি। ধ্রুব তাড়াতাড়ি হাসপাতাল যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। ব্রেন টিউমারের কেস মাসে অন্তত একটা তার হাতে আসে, কিন্তু ব্রেন ক্যান্সার সচরাচর দেখা যায় না।

৩

হাসপাতালে ঢুকেই ধ্রুব প্রথমে পেশেন্টের রিপোর্টগুলো চেক করল। সব দেখে বুঝল পেশেন্টের কাছে আর হয়তো দুটো কি তিনটে দিন আছে।

পেশেন্ট এখন কি এখানেই ভর্তি আছে? ধ্রুব জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ - ধ্রুবর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সটি বলল।

- বাড়ির লোককে বলুন, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আমাদের আর কিছুই করার নেই।

- আসলে স্যার, পেশেন্টের কেউ নেই। সে এক সপ্তাহ আগে একটা নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিল। তারপর তাকে সেখান থেকে এই হাসপাতালে রেফার করা হয়।

বাড়ির কেউ নেই! সে কী! - খানিক চিন্তিত সুরে বলে ধ্রুব। আচ্ছা চল তাকে একবার দেখে আসি। ক্যাবিনে ঢুকেই পেশেন্টের মুখের দিকে তাকাতেই খানিক সন্দেহ হল ধ্রুবর।

তার পরক্ষণেই সে চমকে উঠল। সমাপ্তী! - আর্তনাদ করে উঠল ধ্রুব। সমাপ্তীর গায়ের রং আগের মতোই ফর্সা, মুখের গড়ন এখনও অপূর্ব আছে, তবে অত্যন্ত দুর্বল যেন। তার সেই বড় বড় চোখের পাতা সে বন্ধ করে আছে। সমাপ্তীর এই অবস্থা দেখে ধ্রুবর হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে। বুকের মধ্যে থাকা হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এসেছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে ধ্রুব।

স্যার? স্যার? - নার্সটি ডেকে ওঠে।

- অ্যাঁ... হ্যাঁ, তুমি একটু বাইরে যাও তো। নার্সটি চলে যায়। ধ্রুব সমাপ্তীর বেডের পাশে রাখা টুলটায় এসে বসে। তার উপর তার রাগ-অভিমান সবকিছু ভুলে এক অদ্ভুত কান্না যেন তার ফুসফুসের মধ্যে আঁচড় কাটতে থাকে। সমাপ্তী তো বলেছিল সে অন্য কাউকে ভালোবাসে! তবে এই দুর্দিনেও কেউ তার পাশে নেই কেন?! নাকি সে শুধু লোককে ঠকিয়ে বেড়ায়? প্রয়োজনে ব্যবহার করে তাদের! ভালোই হয়েছে, এমন মেয়ের এই অবস্থা হওয়াটাই ভালো। ধ্রুবর চোখ

দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তারপর সে বেরিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই এক মৃদু কন্ঠস্বর শুনতে পায়— জল... একটু জল।

ধ্রুব পাশের রাখা জলের বোতলটা থেকে একটা গ্লাসে জল ঢালে, তারপর গ্লাসটা সমাপ্তীর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল— মুখটা একটু খুলুন। কথাটা শুনে সমাপ্তী চোখ খোলে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে থাকে — ধ্রুব!!

কিছু মুহূর্ত দুজনে নিঃশব্দে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর অত্যন্ত মৃদু কোমল সুরে সমাপ্তী বলল— কেমন আছো ধ্রুব?

ধ্রুবর মনটা কেমন যেন করে ওঠে। তবুও সে হাসি মুখে বলল— ভালো, বেশ ভালোই আছি। কিন্তু তোমার এই শেষ সময়ে তোমার পাশে কেউ নেই কেন? তুমি যাকে ভালোবাসতে তার কী হল? নাকি তাকেও তুমি ব্যবহার করে মাঝ রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছো?

সমাপ্তী তার সেই রুগ্ণ মুখে হাসতে থাকে।

হাসছো যে? আমি কি কিছু ভুল বললাম? বিরক্ত হয়ে ধ্রুব জিজ্ঞাসা করল।

- ঠিক কি ভুল জানি না, তবে আমি কোনোদিন কাউকে ব্যবহার করিনি।

ও সরি, সরি। আই অ্যাম ভেরি সরি। - ধ্রুবর রাগ আরও বেড়ে যায়।

বলব না বলব না করেও সমাপ্তী বলল- আমার এই রোগের কথা আমি ছ-বছর আগেই জানতে পেরেছিলাম। ডাক্তার বলেছিল টিউমারের পজিশন এমন জায়গায় যে অপারেশন করা সম্ভব নয়। আমার হাতে ছয় সাত বছরের মতো সময় আছে। ধীরে ধীরে এটা আমার শরীরটাকে শেষ করে দেবে।

কথাগুলো শুনে ধ্রুবর মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ল- তার মানে?!

- মানে সেদিন তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম যাতে আজ তোমার বেশি কষ্ট না হয়। আমি যদি সেদিন তোমাকে ছেড়ে না আসতাম, তবে আজ হয়তো তুমি সম্পূর্ণভাবে একা হয়ে যেতে। কিন্তু দেখো, সেদিন একটা মিথ্যে গল্প বলে তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছিলাম বলেই আজ তোমার একটা সুন্দর সংসার হয়েছে, একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ আছে। আজ আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা নয়, ঘৃণা আছে।

এমন কেন করলে তুমি? - ধ্রুব কেঁদে ফেলে। তুমি আমাকে মিথ্যে বলে চলে গিয়েছিলে ঠিকই; কিন্তু ঘৃণা আমি তোমাকে কোনোদিনই করিনি। হ্যাঁ রাগ করেছি ঠিকই, কিন্তু তোমার পর আর কাউকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারিনি। আমার স্ত্রী আছে ঠিকই, কিন্তু তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই আমার।আমার একটা পাঁচ বছরের ছেলে আছে ঠিকই; কিন্তু

দায়িত্ব-কর্তব্যটুকু ছাড়া সে কিছুই পায় না আমার কাছ থেকে । বলো, এটা আমার ভালো থাকা? এটা আমার বেঁচে থাকা?

সমাপ্তী ধ্রুবর হাতটা ধরে বলল- তুমি কি আজও আমায় ভালোবাসো?

ধ্রুব কাঁদতে কাঁদতে বলল- না, একবিন্দু ভালোবাসি না তোমায় আমি ।

- সত্যি?

ধ্রুব সমাপ্তীকে জড়িয়ে ধরে। তার ঘাড়ে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলে, ঠিক আগে যেমন করে কাঁদত ।

- ধ্রুব, এমন করে কেউ কাঁদে? এমন করে কেঁদো না। আমার কষ্ট হয় না বল?

- সমাপ্তী, কেন আমার সাথে তুমি এমন করলে? কেন জানালে না আমাকে সবটা?

তোমাকে যদি জানাতাম তবে তোমার সাথে এই ছটা বছর হয়তো খুব ভালোভাবেই কাটাতাম; কিন্তু আজ যে তুমি শেষ হয়ে যেতে গো!! ভালোবাসা তখনই পূর্ণতা পায় যখন ভালোবাসা একটা মানুষকে ভালো রাখে, একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে ।

তোমার ভালোবাসা পূর্ণতা পেয়েছে, কিন্তু আমার ভালোবাসা আমাকে ঠকিয়ে আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। আমার ভালোবাসা পারেনি তোমাকে ভালো রাখতে, পারেনি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে - কাঁদতে কাঁদতে বলল ধ্রুব।

- এমন করে বলো না ধ্রুব! তোমার ভালোবাসাও পূর্ণতা পাবে । যে কটা মুহূর্ত আমি এই পৃথিবীতে আছি, সেই কটা মুহূর্ত আমার পাশে থাকবে ধ্রুব?

- হ্যাঁ, চল আমি তোমাকে নিয়ে যাব ।

- কোথায়?

- আমাকে বিশ্বাস করো?

- নিজের থেকেও বেশি ।

৪

ধ্রুব সমাপ্তীকে কোলে তুলে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তারা। শহর থেকে বেরিয়ে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যায়। তারপর আবার একটা শহর পেরিয়ে যায়। দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়, সন্ধ্যায় গিয়ে রাত্রি হয়। শেষমেষ তারা এসে পৌঁছায় দার্জিলিং-এ। সেখানে একটা হোটেল বুক করে ধ্রুব সমাপ্তীকে নিয়ে যায়। প্রথমে তাকে কিছু খাবার খাইয়ে দেয়, তারপর ধ্রুব সমাপ্তীর মাথাটা তার কোলের ওপর রাখে।

- মনে আছে সমাপ্তী, আমরা বিয়ের পর কোনো এক পাহাড়ী এলাকায় বেড়াতে আসব ঠিক করেছিলাম?

- আমাদের তো বিয়ে হয়নি!

- কি জানি কথাটা আমার বলা উচিত নয়, তবুও বলছি— আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছে আজ আছে?

- কেন জিজ্ঞেস করছো ধ্রুব? তোমার ঘরে বউ আছে, ছেলে আছে। একবার ভেবে দেখেছ তারা যদি এসব জানতে পারে কত কষ্ট পাবে তারা? বিনা দোষে তাদের কেন শাস্তি দিচ্ছ ?

- এতদিন ধরে তারা আমাকে এইভাবে মেনে নিয়েছে সমাপ্তী। তাছাড়া তারা আজ এই দিনটার কথা কোনো দিন জানবে না। শুধু তুমি আমি আর এই মুহূর্তটা ছাড়া কেউ জানবে না। তুমি এবার বল বিয়ে করবে আমাকে ?

- করতে পারি, তবে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে।

- কী কথা বল?

- আমি চলে যাওয়ার পর তুমি মন দিয়ে সংসার করবে। তোমার বউ, ছেলের সব ইচ্ছে পূরণ করবে। তাদেরকে নিয়ে তুমি ভালো থাকবে। কথা দাও।

- বেশ। তাই হবে। এই মিথ্যে অভিনয়ে যদি সকলে ভালো থাকে তবে তাই হবে। শুধু তোমার সাথে কাটানো সময়টুকু আমার জীবনে সত্যি হয়ে থাকবে। তুমি

হয়তো চলে যাবে, কিন্তু আজ থেকে সবসময় তুমি থাকবে আমার সাথে আমার সত্যিকারের জীবনসঙ্গিনী হয়ে। বল বিয়ে করবে আজ আমাকে ?

সমাপ্তী কোনো কথা বলতে পারল না, শুধু একটি আওয়াজ করল- হুঁ। সে ধ্রুবকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল ।

ধ্রুব কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে যায় । তারপর ফিরে এসে সমাপ্তীর পাশে বসে । সে পকেট থেকে একটা সিঁদুর কৌটো বের করে, তারপর সেখান থেকে খানিকটা সিঁদুর নিয়ে সমাপ্তীকে পরিয়ে দেয় । সমাপ্তী ধ্রুবকে জড়িয়ে ধরে ।

- আমার জীবনটা তুমি সম্পূর্ণ করে দিলে ধ্রুব! কিন্তু আমার হাতে আর বেশি সময় নেই গো, এবার আমায় বিদায় দাও। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। মাথার ভেতরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

- এমন করে বলো না সমাপ্তী! আমি মরে যাব!

- আবার! এমন করতে নেই। আমার যে উপায় নেই। তোমাকে ভালো থাকতে হবে আমার জন্য । কথা দাও ভালো থাকবে? কি গো কথা দাও?

- না পারব না আমি। তুমি খুব বাজে ।

আমি জানি আমি বাজে । কিন্তু তুমি তোমার দেওয়া কথা রাখবে। তুমি মন দিয়ে সংসার করবে। কি গো বল?

আমি আর পারছি না। কথাটা বলেই সমাপ্তীর সমস্ত শরীরের ভারটা ধ্রুবর শরীরে গিয়ে পড়ে ।

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাইনা, সমাপ্তী? ধ্রুব কয়েকটা ওষুধ বের করে সমাপ্তিকে খায়িয়ে দেয়। আমি কথা দিচ্ছি আমি ভালো থাকব, আমি সংসার করব ।

- আমার আর একটা কথা রাখবে ধ্রুব?

- বল।

- আমার জন্য একটা গান গাইবে?

ধ্রুব সমাপ্তীর মাথাটা তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গান শুরু করে। রবীন্দ্রনাথের এই গান যেন এই সময়টার জন্যই লেখা হয়েছিল-

“ তোমায় গান শোনাবো
তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া
তোমায় গান শোনাবো
চমক দিয়ে তাই তো ডাকো
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো
ওগো দুখজাগানিয়া
তোমায় গান শোনাবো
ওগো দুখজাগানিয়া
তোমায় গান শোনাবো

এলো আঁধার ঘিরে
পাখি এলো নীড়ে
তরী এলো তীরে
এলো আঁধার ঘিরে
পাখি এলো নীড়ে
তরী এলো তীরে
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া
তোমায় গান শোনাবো
ওগো দুখজাগানিয়া
তোমায় গান শোনাবো

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে
আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে
আমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে তুমি যাও যে সরে
আমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে তুমি যাও যে সরে
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখজাগানিয়া
তোমায় গান শোনাবো

ওগো দুখজাগানিয়া
তোমায় গান শোনাবো”

আদর

১

এখন ডিসেম্বর এর প্রায় শেষ, এখানে পাহাড়ের জলবায়ুতে এই গোটা মাস প্রায় সূর্য মামার মুখ দেখা যায় না বললেই চলে। সারাটা দিন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ফলে ঠান্ডা কেমন সে তো বুঝতেই পারছেন। তার উপরে আজ ভোর রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ফলে ওই আগুনে ঘি ঢালা হয়ে... না না, বরফে নুন ঢালার অবস্থা হয়েছে।

- কিরে এখানে এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছিস যে?!

সৈকতের ডাকে যেন চমকে উঠল প্রিয়া। এতক্ষণ দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল সে। বৃষ্টিই দেখছিল কি? না। বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে আসা অতীতটাকে দেখছিল সে। অতীতের মানুষটা, অতীতের পরিচয়, অতীতের একটা গল্প। সত্যিই সবটাই অতীত হয়ে গেল আজ!

- না, কিছু না। এমনিই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এখানে কী করছ?

- না, কিছু করছি না। মানে একই বাড়িতে আমরা দুজন ভাড়া থাকি তো, তাই এই ব্যালকনিতে আসার অধিকার বোধ হয় আমার আছে। মানে তুই যদি বলিস তো।

এরকম করে কেন বলছো সৈকতদা? আমি তো এমনিই বললাম। প্রিয়া বলল।

হ্যাঁ, এমনি করে বলেই একদিন সৈকতের প্রপোজালটা ফিরিয়ে দিয়েছিল প্রিয়া। তখন সে কলেজের ফার্স্ট ইয়ার আর সৈকত থার্ড ইয়ার। সৈকত দেখতে যাকে বলে ভীষণ সুন্দর আর ভীষণ ভালো গিটার বাজায়। প্রিয়াকে বেশ কিছুদিন শিখিয়েও ছিল গিটার, কিন্তু শিখতে আর পারল কই। প্রিয়া যেটা পারত সেটা হল কবিতা। অসম্ভব সুন্দর কবিতা লিখত। সেই কবিতাই ভাসিয়ে নিয়ে গেল সৈকতকে। ভাসিয়ে নিয়ে গেল একান্তে, নির্জনে, যেখানে তার গিটারের সুরও হার মেনে যেত। তাই প্রিয়ার জন্মদিন সে বলেই ফেলল তার মনের কথাটা। কিন্তু তখন সৈকত জানত না যে প্রিয়া তার হবে না কোনোদিন। কারণ সে তখন অন্য কারোর। সে তখন পল্লবের। সেদিনের পর থেকে সৈকত আর আসেনি প্রিয়ার কাছে। কিন্তু ভাগ্যে ছিল অন্য কিছু। আজ প্রায় পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। প্রিয়া

যে অফিসে কাজ করে, সৈকত সেখানকার প্রজেক্ট ম্যানেজার। শুধু তাই নয়, সৈকত যে বাড়িটাই ভাড়া ছিল, সেখানেই ভাড়া নিয়েছে প্রিয়া। কোনো কিছুই কারোরই জানা ছিল না, সবই নিয়তি।

- কি হয়েছে বলতো তোর? এই এক সপ্তাহ হল এখানে এসেছিস। সবসময় এরকম মনমরা হয়ে থাকিস। আমার জন্য কোনো সমস্যা থাকলে বলিস, আমি চলে যাব অন্য কোথাও।

কথাটা জিজ্ঞাসা করল সৈকত।

- আমি একবারও বলেছি যে তোমার জন্য আমার এখানে সমস্যা হচ্ছে? শুধু শুধু এসব ভাবছো কেন তুমি?

- দেখ তোকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মনমরা হয়ে বসে আছিস। কি হয়েছে বলবি একটু?

- না, সেরকম কিছু না। আসলে...

- দাঁড়া, আগে ভেতরে চল। ঠান্ডা লেগে যাবে এখানে আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই।

এই ঠান্ডার মধ্যেও বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক উষ্ণতার আঁচ পেল প্রিয়া। সৈকতের এই বকুনি আজ সে আর এড়িয়ে যেতে পারল না। সৈকতের কথামত ভেতরে ঢুকে গিয়ে বসল সে।

- এবার বল, কী হয়েছে? সৈকত জিজ্ঞাসা করল।

- না, মানে...

- বল?

- পল্লবের সাথে আমার আর সম্পর্কটা নেই সৈকতদা।

- নেই মানে?

- পল্লব আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এই বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল প্রিয়া। দুই হাতে মুখ চেপে কাঁদতে শুরু করল।

সৈকত প্রিয়ার কান্না থামানোর চেষ্টা করল- দাঁড়া, দাঁড়া। আরে এই দেখ, আরে এই... কি হয়েছে ঠিক করে বল তো। ছেড়ে চলে গেছে মানে?

- একদিন হঠাৎ করেই ফোন করে বলল "আমাদের আর একসাথে থাকা হবে না। মানে দেখ তুই এক জায়গায় আর আমি এক জায়গায়। ওরকম করে হয় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “ওরকম করে হয় না মানে? কি বলতে কী চাইছিস তুই?”

ও বলল “দেখ পরিষ্কার ভাবে বলছি, আমি তোর সাথে আর সম্পর্ক রাখতে চাইছি না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে তোর কাছে থাকলে। আমি সকালে ঘুম থেকে ওঠার থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া অবধি কখন কি করছি না করছি সব তোকে জানতে হবে? কখন খাচ্ছি, কখন কোথায় যাচ্ছি, কখন কার সাথে কথা বলছি সব? আমি তোর হাতের পুতুল?

আমি বলেছিলাম “ এসব কি বলছিস তুই? বেশ ঠিক আছে তুই যখন বলছিস, আমি আর কিছুই জানতে চাইব না। কিন্তু রিলেশনটা শেষ করে দিস না প্লিজ।”

ও শোনেনি আমার কথা। “না, আর সম্ভব নয়। ভালো থাকিস। বাই " I ব্যাস, এই বলে ফোন কেটে ব্লক করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। আর কোনো যোগাযোগ করেনি।

পরে ওর এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারি ওর অফিসেরই কোনো এক মেয়ের সাথে রিলেশন-এ জড়িয়েছে। আমিও আর কোনো খবর নিইনি তারপর থেকে। কিন্তু সবকিছু ভুলে যাই কি করে বলোতো সৈকতদা? দুজনে দুজনকে কথা দিয়েছিলাম সারাটা জীবন একসাথে কাটাবো, কত স্বপ্ন দেখেছিলাম দুজনে। কী করে ভুলে যাই বলোতো সবকিছু?

- হুম, বুঝলাম। দেখ যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এখন তোকে ভুলতে হবে। কষ্ট হবে, কিন্তু তাও তোকে সব কিছু ভুলে আবার নতুন করে বাঁচতে হবে। জীবনে খারাপ সময় তো আসবেই। কিন্তু সেটাকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সৈকত প্রিয়াকে হাসানোর জন্য মজা করে বলল- এবারে কতটা এগিয়ে যেতে হবে সে তো আপনাকেই ঠিক করতে হবে ম্যাডাম।

- মানে? কান্না থামিয়ে বলল প্রিয়া।

- মানে আবার কি, পরশু ২৫ শে ডিসেম্বর আর কাল রবিবার। তো কাল থেকে ফার্স্ট জানুয়ারি অবধি অফিস বন্ধ। চল কোথাও ঘুরে আসি। কোথায় যাবি বল?

- না, সৈকতদা কোথাও যাব না। ইচ্ছে নেই।

- দেখ এটা কিন্তু তুই ঠিক করছিস না। নিজে আনন্দ করবি না, তাই বলে আমার আনন্দটাও মাটি করছিস?

- দেখেছো, আমি কি করলাম এখানে? আমি কি তোমাকে যেতে বারণ করেছি?

"জল টুপটুপ দুপুরবেলা,

শান্ত চোখে জলের ছোঁয়া,

তোকে ছাড়া দিন আসে না

প্রিয়া আমার সুরের ধারা।"

- সৈকতদা!

- অবাক হচ্ছিস? তোরই তো লেখা।

- ওখানে প্রিয়া ছিল না। আর আমি যাব না, ব্যাস।

- দেখ আমার জোর করার অধিকার নেই। আমাকে বন্ধু হিসেবেও অ্যাক্সেপ্ট নাই করতে পারিস, কিন্তু মনে রাখবি আমি তোর অফিসের বস। আমাদের নতুন প্রজেক্টের জন্য কিছু ইনফরমেশন দরকার। যেমন ধর ইন্ডিয়াতে যত গ্রাম আছে সেখানে আমরা আমাদের প্রোডাক্ট কিভাবে লঞ্চ করব বা ধর সেখানে কমিউনিকেশন সিস্টেম কেমন, এইসব আরকি।

- ইয়ারকি পেয়েছো? এসব আমার কাজ নাকি?

- হ্যাঁ মানছি, এসব তোর কাজ নয়। কিন্তু তুই কি চিরকাল এই পজিশনেই থাকবি? প্রমোশন চাস না?

- তুমি কিন্তু আমায় ব্ল্যাকমেল করছো!

- পুরো দুনিয়াটাই যখন ব্ল্যাক সেখানে আমি একটু হলামই বা! দেখ তুই যাচ্ছিস এটা ফাইনাল, আমি আর কোনো কথা শুনব না।

২

আজ ২৪শে ডিসেম্বর, সৈকতের কথামত সকাল দশটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সৈকত আর প্রিয়া। এত জোরাজোরির পর প্রিয়া শেষটায় আর 'না' করতে পারেনি সৈকতকে।

কিরে চুপচাপ বসে আছিস? আমাকে পছন্দ করিস না জানি, কিন্তু এতটা অপছন্দ করিস?- প্রিয়াকে চুপচাপ গাড়ির জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল সৈকত।

- দেখ সৈকতদা আমার আনন্দ করার মত মানসিক অবস্থা নেই। কিছুই ভালোলাগে না আমার আর।

হঠাৎ জোরে ব্রেক কষল সৈকত। গাড়িটা এসে থামল ফাঁকা রাস্তার একটা পাশে। সামনে একটা বড় ফাঁকা মাঠ। দূরে বড় বড় কিছু গাছপালা দেখা যাচ্ছে, আরও দূরে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে ঠান্ডা নীল আকাশ।

- কি হল? এখানে গাড়ি থামালে কেন সৈকতদা?

- নাম, ওই দেখ ফাঁকা মাঠ। যাকে যা বলার আছে, চিৎকার করে বল। কেউ কিছু বলবে না, কেউ অভিযোগ করবে না। মনের মধ্যে যত কষ্ট আছে, যত রাগ আছে সব বের করে দে।

- সৈকতদা!

- চুপ, আর একটাও কথা নয়, যা বলছি।

প্রিয়া সামনের দিকে এগিয়ে গেল, খুব বেশি দূরে না তবুও সৈকতের চোখে ঝাপসা হয়ে এল প্রিয়া। সৈকতের চোখের জল ঝাপসা করে দিল সামনের সমস্ত কিছু। আজও সে প্রিয়াকে ভালোবাসে। পাঁচ বছর আগেও ভালোবেসেছিল, তাই তো চলে গিয়েছিল, কারণ তার চলে যাওয়াতে প্রিয়ার ভালো থাকা ছিল। কিন্তু আজ সেই মানুষটা যদি এত কষ্টে থাকে তাহলে সে মেনে নেবে কি করে? যাই হয়ে যাক না কেন সে শুধু চায় প্রিয়া যাতে ভালো থাকে, পরিবর্তে সে কিছুই চায় না।

খানিকক্ষণ পর সৈকত হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পায়।

- সৈকতদা... বাঁচাও, মরে গেলাম।

সৈকত তাকিয়ে দেখে দূরে একটা বট গাছের ঝুরি ধরে ঝুলছে প্রিয়া। খানিকটা এগিয়ে সে দেখতে পায় বট গাছটা একটা পুকুরের ধারে। তার ঝুরি যেখানে ঝুলছে তার নীচে জল।

- কীরে কী হল? ওখানে ওভাবে ঝুলছিস কেন?

- সৈকতদা... সা-আ-আ-প!

- কী?!

সৈকত নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা চিতি এই শীতের দুপুরে পুকুর পাড়ে রোদে শুয়ে বেজায় একটা ঘুম দিচ্ছে। এখন ওর ঘুমের কেউ ব্যাঘাত ঘটালে তিনি তাকে দায়িত্ব নিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দেবেন।

- দাঁড়া ভয় পাস না, আমি পুকুরের ওই দিকটা দিয়ে নীচে নামছি। জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। সাঁতার জানিস তো?

- হ্যাঁ, সে জানি, কিন্তু...

- আবার কি?

- জলেও যদি সাপ থাকে?

- ফালতু বকিস না, কিচ্ছু হবে না। আসছি দাঁড়া।

সৈকত জলে নেমে প্রিয়ার কাছে গেল - নে ঝাঁপ দে।

- Sure তো?

- আরে হ্যাঁরে বাবা, তাড়াতাড়ি কর।

প্রিয়া ঝাঁপ দিল, আহ্... করে আর্তনাদ করে উঠল। সৈকত কোনো মতে তাড়াতাড়ি করে প্রিয়াকে জল থেকে টেনে নিয়ে এল পাড়ের অন্যদিকটা দিয়ে।

ততক্ষণে প্রিয়া যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে- পারছি না সৈকতদা, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

সৈকত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল- কী হল? কোথায় লেগেছে?

পা টা... প্রিয়া দুহাত দিয়ে তার পাটা চিপে ধরল।

সৈকত দেখল পায়ের তলা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। একটা কাঁচ ঢুকে আছে পায়ে, অনেকটা কেটে ঢুকে আছে। সৈকত সঙ্গে
সঙ্গে প্রিয়াকে ধরে বসায়।

- কি করে হল রে! দাঁড়া দাঁড়া, এ তো অনেকটা কেটে গেছে রে! সৈকত কাঁচটা বের করে পকেট থেকে রুমাল বের করে পায়ে বেঁধে দিল।

- চল আগে গাড়িতে চল, ওখানে ফার্স্ট এইড আছে। চল আস্তে আস্তে ওঠ। প্রিয়া সৈকতর হাত ধরে কোনোমতে আসে গাড়ির কাছে। সৈকত গাড়ি থেকে ওষুধ বের করে ওষুধ লাগিয়ে তার উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়।

কি হল বল দেখি। সব আমার জন্য। কেন যে তোকে ওখানে যেতে বললাম। চল ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে - সৈকত বলল।

- না না। তার কোনো দরকার নেই।

- চুপ একদম। তুই এক্ষুনি যাবি ডাক্তারের কাছে। স্টিচ করতে হবে। অনেকটা কেটে গেছে।

৩

এখন রাত আটটা পনেরো। একটা রিসর্টে এসে উঠেছে প্রিয়া আর সৈকত। প্রিয়া এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে রেস্ট নিচ্ছিল। পায়ের ব্যথাটা খুব বেড়েছে, তার উপর হাতে ইনজেকশন এর ব্যথাও আছে। এমন সময়, দরজায় টোকা পড়ার শব্দ।

- আসতে পারি?

- ও! সৈকতদা এস।

সৈকত এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে প্রিয়ার পাশে বসল। এখন কেমন আছিস? পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে তাই না?

- হ্যাঁ, ওই আর কি।

- দাঁড়া গরম জল আনতে বলেছি, নিয়ে আসুক। ওই জায়গাটা ড্রেসিং করতে হবে। আচ্ছা তোর ঠিক কি হয়েছিল বলতো?

আসলে আমি অন্যমনস্ক ভাবে পুকুর পাড়ে চলে গিয়েছিলাম তারপর হঠাৎ করে একটা পানকৌড়ি দেখতে জলের দিকে একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ফিরে আসার সময় দেখি কি একটা জিনিস চকচক করছে। একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখতেই বুঝতে পারি ওটা সাপ। আমি কি করব বুঝতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে গাছের ঝুরি ধরে ঝুলে পড়ি।

বাবু, গরম জলটা নিয়ে এসেছি। কোথায় রাখব? একটা বৃদ্ধ লোক একটা স্টিলের বাটি ভর্তি জল কাপড় দিয়ে ধরে নিয়ে এসেছে।

- দাও আমাকে দাও। আর প্রিয়ার খাবারটাও নিয়ে এস কেমন। - সৈকত বলল।

- আচ্ছা। এই বলে বৃদ্ধ লোকটা বেরিয়ে যায়।

- দেখি পা টা। সৈকত প্রিয়ার পায়ের ব্যান্ডেজটা খুলে ভালো করে ড্রেসিং করে দিল।

- আচ্ছা, সৈকতদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

- হ্যাঁ বল। এত হেজিটেট করছিস কেন?

- তুমি আজও কী আমাকে ভালোবাসো?

সৈকত কথাটা শুনে খানিকক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। হঠাৎ ওই বৃদ্ধ লোকটির ফিরে আসার শব্দে ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙল।

- বাবু, এই যে খাবারটা। লোকটা বলল।

সৈকত জবাব দিল- হ্যাঁ, টেবিলে রেখে দাও।

- আচ্ছা। এই বলে খাবারটা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে লোকটা বেরিয়ে যায়।

সৈকত প্রিয়াকে বলল - নে তাড়াতাড়ি খাবারটা খেয়ে নে। তারপর ঘুমিয়ে পড়। দেখ ব্যথাটা কমে যাবে।

প্রিয়া বলল- আমার কথাটার উত্তর দিলে না যে? আচ্ছা ছাড়ো এসব। কতদিন গান শুনিনি তোমার। একটা গান গাও না!

- জীবনে দুটো জিনিসকেই ভালোবেসেছিলাম। এক গান আর দুই...

- দুই?

- একটা মেয়ে। দুটোর কোনোটাই পাওয়া হয়নি আমার। তাই আর ওসব নিয়ে ভাবি না।

নে এবার বেশি না বকে খাবারটা খেয়ে শুয়ে পড়। কাল সকালে আবার বেরোবো। সেই শান্তিনিকেতন, পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে।

৪

আজ ২৭শে ডিসেম্বর। সৈকত আর প্রিয়া শান্তিনিকেতনে সৈকতের মাসির বাড়িতে এসেছে। সৈকত ছোটো থেকে এই মাসির কাছেই মানুষ। এটাই ওর ঘর, এটাই ওর পরিবার। এখন এই বাড়িতে শুধু ওর মাসি আর মেসোমশাই থাকে। তাদের এক ছেলে আজ 2 বছর হল বিদেশে।

প্রিয়া এখনও ঠিকমতো করে হাঁটাচলা করতে পারছে না। সৈকতের মাসি খুব ভালোমতো দেখাশোনা করছেন প্রিয়ার। মেসোমশাই ও খুব মজার মানুষ। প্রিয়ার সাথে কত গল্প করছেন, কত মজার মজার কথা বলছেন আর প্রিয়াও মন খুলে হেসেছে বহুদিন পর। আর এই সবকিছু সৈকত মাঝে মাঝে দরজার পাশে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, কখনও বা সামনে থেকে দেখছে। সৈকত তো এটাই চেয়েছিল। প্রিয়া যাতে একটু ভালো থাকে, ওর হারিয়ে যাওয়া হাসিটা যেন আবার ফিরে আসে।

এখন সন্ধ্যে বেলা। সৈকত একটা ঘরে বসে ল্যাপটপ নিয়ে কিছু কাজ করছিল। হঠাৎ দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় প্রিয়া- আসব সৈকতদা?

- একি তুই? এই পা নিয়ে তোকে কে আসতে বলল? কিছু দরকার থাকলে আমাকে বলতিস, আমি নিজে চলে যেতাম।

প্রিয়া এসে সৈকতের পাশে বসল।তারপর বলল, একবার ছাদে যাবি আমার সাথে?

সৈকত তো অবাক, ছাদে? এই ঠান্ডায়?

- যাবি না?

সৈকত না করতে পারল না। বেশ যাচ্ছি, আগে গায়ে ভালো করে চাদর জড়িয়ে নে, ঠান্ডা লেগে যাবে নয়তো।

কিছুক্ষণ পর ওরা দুজনে ছাদে এল। চাঁদের আলোতে চারিদিকটা ভরে আছে। জায়গাটা বেশ নির্জন। এই বাড়ির পাশাপাশি সেরকম কোনো বাড়ি নেই। দূরে মাঠ দেখা যাচ্ছে। বাতাসের ভাঁজে ভাঁজে জ্যোৎস্না চিকচিক করছে। শীত গায়ে

কুয়াশা মাখছে ধীরে ধীরে। বাড়ির আমগাছটা ছাদের একটা কোণায় ঝুঁকে পড়েছে।

- কিছু বলবি? প্রিয়াকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সৈকত জিজ্ঞাসা করল।

প্রিয়া কোনো কথা না বলে সৈকতকে জড়িয়ে ধরল আর মুহূর্তের মধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়ে।

- এই দেখ। এই ? কী হল তোর?

- আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আর পারছি না আমি।

- বেশ কেঁদে নে, যত কষ্ট আছে সব আজ বের করে দে। অনেক দিন ধরে কষ্ট চেপে রেখেছিস।

কিছুক্ষণ পর প্রিয়া নিজেকে কিছুটা সামলে নিল।

- কিরে? ঠিক লাগছে এখন কিছুটা?

- হুম। I am sorry, আমার এভাবে বিহেভ করা উচিত হয়নি। আমি আসলে...

- আরে ঠিক আছে, আমি কিছু বললাম তোকে? সবসময় ভালোবাসা, প্রেম করা এসবের জন্য কি একটা মানুষকে প্রয়োজন হয়? কখনও কখনও কারোর বুকে মাথা রেখে শুধুমাত্র কাঁদার জন্যও তো একটা মানুষের প্রয়োজন হয়। আমি তোর ভালোবাসার মানুষও নই আর আদর করার মানুষও নই, কিন্তু তোকে একটুখানি শান্তি দেওয়ার মানুষ তো হতেই পারি তাই না? কারোর বুকে মাথা রেখে কাঁদার জন্য সত্যিই কি কোনো সম্পর্ক বা প্রেম করার প্রয়োজন হয়?

- জানো সৈকতদা, পল্লবকে আমি আজকেউ ভুলতে পারিনি। হয়তো পারবও না কোনোদিন। খুব কষ্ট হয় ওর কথা মনে পড়লে। প্রতিটা মুহূর্তে ও আমার সাথে জড়িয়ে আছে। আমি জানি তুমি আমাকে আজও ভালোবাসো। তুমি কি পারবে না পল্লবকে ভুলতে আমায় সাহায্য করতে? তুমি কি...

- না প্রিয়া, এটা তুই ভুল করছিস। আমি তোকে ভালোবাসি, এটা যেমন কোনো অপরাধ নয়, তেমনই তোর কষ্ট পাওয়াটাও মিথ্যে নয়। তুই পল্লবকে ভুলে যেতে আমার সাথে সম্পর্কে জড়াতে চায়ছিস। কিন্তু এসব করে তুই কি ওকে ভুলে যেতে পারবি ? পারবি না। বরং তোর জীবন আরও জটিল হয়ে যাবে। আর ধীরে ধীরে আমি তোর কাছে সব থেকে বড় অপরাধী হয়ে যাব। আমি তোকে একটুখানি শান্তি দিতে পারি কিন্তু সারাটা জীবন তোর কাছে একটা অপরাধী হয়ে বাঁচতে পারব না। এত বড় শাস্তি আমায় দিস না প্লিজ। তুই যদি সত্যিকারের পল্লবকে ভালোবেসে থাকিস তবে এই কষ্টটাই তোর ভালোবাসা, তোর বেঁচে থাকার শক্তি। ঠিক যেমনটা আমার। তোর যখনই দম বন্ধ লাগবে, মন খুলে কাঁদার মত জায়গা খুঁজে পাবি না, তখনই জানবি আমার এই বুকটা আছে

শুধুমাত্র তোর জন্য। তোর সমস্ত চোখের জলে আমার এই বুক ভিজিয়ে নেব। যাতে তোর চোখে আর জল না আসে। তোর সারাজীবনের বন্ধু আমি। তাই এর জন্য অন্য কোনো সম্পর্কের সমীকরণের প্রোয়োজন হবে না আমাদের।

চল এবার নীচে চল। ঠাণ্ডা লেগে যাবে এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে- সৈকত কথাগুলো বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

- সৈকতদা? একটা গানও কি গাওয়া যায় না আমার জন্য?

সৈকত হেসে বলল - যে আমার নয়, তাকে কি আদর করা যায়?